# কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

এপ্রিল ১৯৮৭

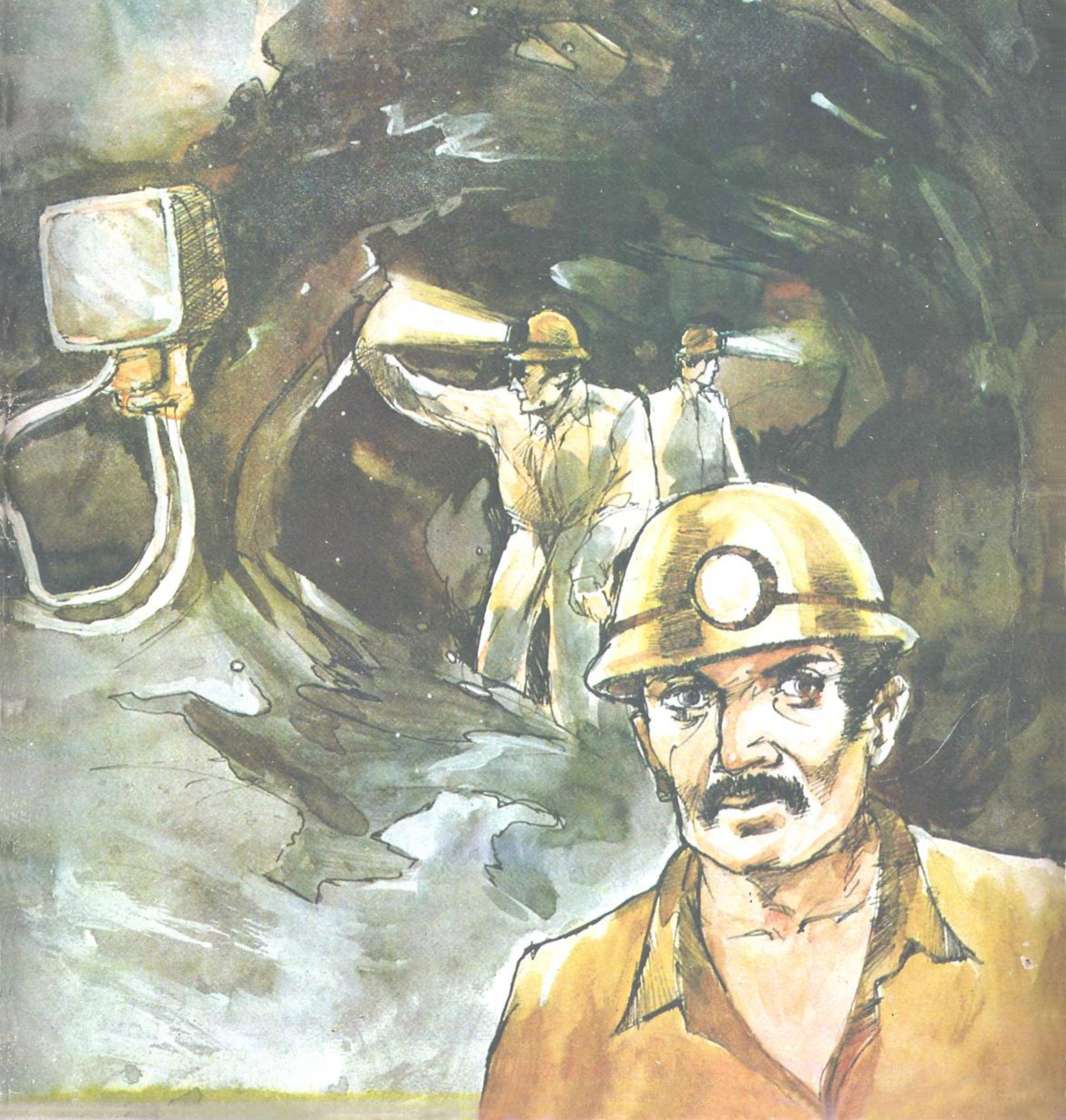

## ছোটদের জন্য অভিনব সাধারণ জ্ঞানের বই

দু'খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে ।

যে বই ছেলেমেয়েদের ক্লাসের
পড়াতেও সাহায্য করবে

# স্টুডেন্ট নলেজ গাইড

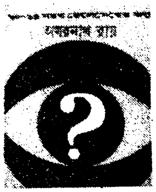


১ম : ১০ থেকে ১৪ বছরের জন্য ॥ VI-VIII
২য় : ১৪ থেকে ১৬ বছরের জন্য ॥ IX-X
প্রতি খণ্ড ১২ টাকা ॥ V. P. P. ১৫ টাকা

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের
## বাঙলার গাছপালা
মূল্য : দশ টাকা
৩০টি আলোকচিত্র

## সচিত্র জ্ঞানবিজ্ঞান

এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ॥ **বিচিত্র বিজ্ঞান** ৮
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ **যুক্তিতর্ক হেঁয়ালি** ৮
বিমান বসু ॥ **গ্রহ পরিচয়** ১২
পার্থসারথি চক্রবর্তী
**মাটি থেকে আকাশে** ১০
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
**বিজ্ঞানের আকস্মিক আবিষ্কার** ৮
অমরনাথ রায় ॥ **সংখ্যা নিয়ে খেলা** ৮
**জ্ঞানবিজ্ঞানের মজার খেলা** ১০
সিদ্ধার্থ ঘোষ
**অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক** ১৫

১৯০১ সাল । পদার্থবিজ্ঞানে প্রথম নোবেল পুরস্কার পেলেন এক্স-রশ্মির আবিষ্কারক ভিলম হেলম কমবাড রয়েন্টগেন । সেই থেকে শুরু। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ পদক্ষেপের জন্য নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হয়ে আসছেন বিশ্বের বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগণ । কিন্তু তাঁদের অবদান ও আবিষ্কারের কথা আমরা কতটুকুই বা জানি ? জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক সমরজিৎ কর তাঁর স্বাদু কলমে পরিবেশন করেছেন সেইসব রোমাঞ্চকর ও কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য যা গল্প উপন্যাসের চাইতেও রোমাঞ্চকর

বাংলায় বিজ্ঞান রচনায় অগ্রপথিক
সমরজিৎ করের **নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী**
তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ॥ দাম ২০

## অঙ্কের ম্যাজিক খেলার লজিক

**তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে** ১৫
খেলার নির্দেশসহ একটি বই
আস্ত বই ও দশরকম খেলার
সরঞ্জাম সহ সিদ্ধার্থ ঘোষের
আশ্চর্য বইয়ের বাক্স ।

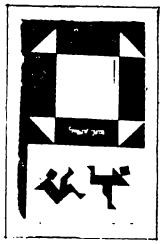

## বুদ্ধি ও মেধা চর্চার জন্য

অমরনাথ রায় ॥ **নলেজ ক্যুইজ** ১০
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ **গণিত ক্যুইজ** ১০
অমরনাথ রায় ॥ **সায়েন্স ক্যুইজ** ১০
অলক চক্রবর্তী ॥ **ফিজিক্স ক্যুইজ** ১০
অমরনাথ রায় ॥ **কেমিস্ট্রী ক্যুইজ** ১০
তারকমোহন দাস ও সীমা সেন **লাইফ সায়েন্স ক্যুইজ** ১০

## বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প

**লীলা মজুমদার** ॥ কল্পবিজ্ঞানের গল্প ১৫
**ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য** ॥ লুপ্তধন ৮
**ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য** ॥ মেঘনাদ ১০
**অদ্রীশ বর্ধন** ॥ কিশোর সায়েন্স ফিকশন ১৫
**ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য**
তুষারলোকের রহস্য ৮

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ
৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৯

ষষ্ঠ বর্ষ ঃ দ্বাদশ সংখ্যা এপ্রিল 1987

# কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

## আগামী সংখ্যা থেকে

বর্তমান সংখ্যা কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্ষশেষ সংখ্যা।

প্রতি বছরের মতো এবারেও পত্রিকায় নতুন বিষয় সংযোজন করার কথা ভাবা হয়েছে। যার কিছু কিছু তোমরা নতুন বছরের প্রথম সংখ্যা থেকেই দেখতে পাবে।

আপাততঃ দুটো খবর জানাই।

এক ঃ 'নিজে নিজে কর' বিভাগের পাঠকদের দীর্ঘদিনের দাবী মডেলের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্স মডেল। 'নিজে নিজে কর' বিভাগে তোমরা যেসব মডেল তৈরি করে পাঠাচ্ছ—সেগুলি তো প্রকাশিত হবেই—এছাড়া আরও দু তিনটি মডেল নিয়মিত প্রকাশিত হবে সার্কিট ডায়াগ্রাম সহ যা তোমরা নিজেরাই সহজে তৈরি করতে পারবে। এই মডেলগুলি নির্মাণ করবেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ও লেখকগণ।

দুই ঃ অনেক পাঠকের দীর্ঘদিনের দাবী—ছবিতে গল্পের সংখ্যা বাড়ানোর। তাদের জানাই এবার থেকে নিয়মিত তিনটি চিত্রকাহিনী কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রকাশিত হবে। শিল্পী দিলীপ দাসের খুদে বৈজ্ঞানিক তো চলবেই। শিল্পী গৌতম কর্মকারের "ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ড'স" শেষ হওয়ার ফলে জুলে ভার্নের কাহিনী অবলম্বনে শুরু হচ্ছে—"ব্ল্যাক ডায়মণ্ডস"। শিল্পী গৌতম কর্মকার নতুন সংখ্যা থেকে আরও একটি চিত্র কাহিনী শুরু করবেন যা রহস্য কাহিনীর মতোই রোমাঞ্চকর—"অভিযাত্রী কলম্বাস"।

এছাড়া অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ তো থাকবেই।

সম্পাদক : কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

## সূচীপত্র

চিঠিপত্র 4 দপ্তর থেকে ঃ লালের জোয়ার যেখানে ॥ সমরজিৎ কর 8

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প : বালি চাপা মদনমোহন ॥ সঙ্কর্ষণ রায় 34 ঃ পাথরের আর্তনাদ ( রে ব্রাডবেরী ) ॥ অনুঃ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় 47

বিশেষ রচনা ঃ কয়লা যেন কামধেনু ॥ আব্দুল হক খন্দকার 19

পড়াশোনা ঃ সবচেয়ে হাল্কা মৌল ॥ অমরনাথ রায় 16 ঃ যাদুবর্গ ॥ সুব্রত কুমার রজক 51

জ্ঞান বিজ্ঞানের নির্বাচিত রচনা ঃ মোটর গাড়ির চার্জার-কাম-ব্যাটারী এলিমিনেটর ॥ পার্থ সারথি চক্রবর্তী 15 : লবণ খাওয়ার প্রয়োজন আছে কি ? ॥ সুব্রত শীল 54 : বিজ্ঞানের খবর ॥ অমিত চক্রবর্তী 53 : আগুনের কথা ॥ সাধনকুমার গিরি 42 : ফ্যারাও আমলের চিন্তা ॥ কপিঞ্জল শর্মা 38 : বিজ্ঞান সংবাদ 37 : জ্ঞান বিজ্ঞানের বিচিত্র খবর ॥ বরুণ মজুমদার 10

গাছপালা : আন্দামানের ম্যানগ্রোভ ॥ তপন আদক 17

রঙিন ফিচার ঃ রঙ্গন ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস 11 সিনিয়র ক্যুইজ ও ফটোক্যুইজ 12 : জুনিয়র ক্যুইজ ও ফটোক্যুইজ 13 : দীর্ঘায়ু বৃক্ষ রেড উড ॥ তারকমোহন দাস ও সীমা সেন 14 ঃ বিশ্বের জীবজন্তু ॥ অমরনাথ রায় 55 : বুদ্ধিশুদ্ধি ॥ সমীর মণ্ডল 56 : ভূগর্ভের সম্পদ ॥ অমরনাথ রায় 58

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী : উইলিয়াম ক্রুক্‌স ॥ বিবেক রায় 27 : প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ নন্দলাল মাইতি 28 : আইনস্টাইনের চিঠি ॥ সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 29

ছবিতে গল্প : খুদে বিজ্ঞানী ॥ দিলীপ দাস 23 : ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ড'স ॥ গৌতম কর্মকার 43

ধারাবাহিক উপন্যাস ঃ নরবানরের গ্রহে ॥ অদ্রীশ বর্ধন 31

ছোটদের দপ্তর : উত্তরদাতাদের নাম 59 : প্রশ্নোত্তর ॥ সুধাংশু পাত্র 63 : শব্দকূট ॥ শ্রীদাম সরকার 62 ঃ ব্যাটারী এলিমিনেটর ॥ শুভদীপ মল্লিক 61 : ইলেকট্রনিক মোটর সাইকেল হর্ন ॥ তাপসকুমার দাস 62

প্রচ্ছদ : অলয় ঘোষাল ॥

প্রচ্ছদ পরিচিতি ঃ খনির অভ্যন্তরে কর্মরত কয়লাখনির শ্রমিক

প্রধান সম্পাদক ঃ সমরজিৎ কর সম্পাদক : রবীন বল সহসম্পাদক ঃ জয়ন্ত দত্ত

# চিঠিপত্র

## প্রসঙ্গ ঃ প্রাথমিক ইলেক্ট্রনিক্স ও মডেল

আমি 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' পত্রিকাটির একজন আগ্রহশীল পাঠক। এই বইটা আমার খুব ভালো লাগে, বিশেষ করে ইলেক্ট্রনিক্স মডেলগুলি। কিন্তু আপনার কাছে আমার একান্ত অনুরোধ এই যে, ইলেক্ট্রনিক্সের প্রাথমিক জিনিসগুলি সম্বন্ধে যদি আপনার পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়, তাহলে হয়ত, অনেকেই উপকৃত হবে বা হবেন, কারণ সবাই যে ইলেক্ট্রনিক মডেল বুঝতে পারেন বা circuit পড়তে পারেন তা নয়। কিন্তু হয়ত তাদের এ ব্যাপারে জানতে ইচ্ছে করে কিন্তু পয়সা দিয়ে ভর্তি হয়ে শেখা তাদের হয়ে ওঠে না।

সুতরাং এই পত্রিকার মাধ্যমে যদি আপনারা বুঝিয়ে দেন যে কিভাবে বিভিন্ন পার্ট'স্ চিনতে হয়, কোন পার্ট'সের কি symbol ইত্যাদি, তাহলে ইলেক্ট্রনিক্স মডেলের দিকে হয়তো আরও অনেকের আগ্রহ বাড়বে এবং আমরা নিজেরা ছোট খাটো মডেল বানিয়ে আনন্দ পেতে পারি, এবং অন্যদের আনন্দ দিতে পারি। আপনার উপর আশা রাখছি যে এই চিঠি 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকায় প্রকাশিত হলে হয়তো কোনো সহৃদয় ইলেক্ট্রনিক্স বিশারদ এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন, যাতে সে ধারাবাহিকভাবে প্রাথমিক ইলেক্ট্রনিক্স সম্বন্ধে আপনার পত্রিকায় প্রকাশ করতে পারেন। অবশ্য এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য একান্ত কাম্য।

**শ্রী সুবীর কুমার দাস,** 5/সি চণ্ডী বসু লেন, কলিকাতা-700085

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর আকর্ষণ আরও বাড়ানোর জন্যে আমাদের অনুরোধ "নিজে নিজে কর" বিভাগে মডেল-এর সংখ্যা বাড়ানো হোক। এবং সেই সঙ্গে মডেলগুলির মধ্যে যেন অভিনবত্ব ও নূতনত্বও থাকে। এ বিষয়ে আমরা অনেকেই একমত হয়ে চিঠি দিলাম।

**লিজন জোয়ারদার, রিপন জোয়ারদার, উজ্জ্বল দাস ও অনেকে।** ডিব্রুগড়-786001, আসাম।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের জুন, জুলাই ও সেপ্টেম্বর সংখ্যায় দেখলাম মাত্র একটি করে মডেল প্রকাশিত হয়েছে। অন্ততঃ দুটি মডেল রাখার জন্যে আমার প্রিয় পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি।

**শুভাশিস বিশ্বাস,** বগুলা, নদীয়া।

আমি কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান-এর নিয়মিত পাঠক। কিন্তু এটা লক্ষ্য করেছি, পুজো সংখ্যায় নানা ধরনের লেখা থাকলেও—"নিজে নিজে কর" বিভাগ থাকে না। কিন্তু থাকে না কেন? আশা করি এবারের পুজো সংখ্যায় নিজে নিজে কর বিভাগ থাকবে এবং মডেলের সংখ্যাও বেশি হবে।

**জয়ন্ত সরকার,** শ্যামনগর, ২৪ পরগনা।

## আলোক বর্ষ

1986 সালের জুলাই মাসের পত্রিকাটিতে লেখক বলেছেন যে 1 'আলোকবর্ষ মাইল' = 186000 মাইল। সৌরজগতে কোন স্থানের দূরত্ব মাপতে 'আলোকবর্ষ' কথাটি ব্যবহার করা হয়। 'আলোকবর্ষ মাইল' বলে সম্ভবতঃ কোন কথা নেই। দ্বিতীয়তঃ আলোর গতি সেকেণ্ডে 186000 মাইল 1 আলোকবর্ষ $= 186000 \times 60 \times 60 \times 24 \times 365$ মাইল।

**মানস দাশগুপ্ত,** কলকাতা—30

## সিমুলেশন

গত সেপ্টেম্বর কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে একটি ভুল চোখে পড়ল। সন্দীপ সেনের 'সিমুলেশন খেলতে খেলতে শেখা' ব্যাপারটি সুন্দর হলেও একটা ভুল আছে। ভুলটি হল আমাদের দেওয়া র‍্যাংকিংয়ে 15টি জিনিস কিন্তু গণনায় নাসার র‍্যাংকিংয়ে 14টি জিনিস পাওয়া যাচ্ছে। আবার 15টি জিনিস ক্রমানুসারে সাজালে সর্বাপেক্ষা বড় সংখ্যা 15 পাওয়া যাবে কিন্তু নাসার নবম ঘরে 39 সংখ্যাটি পাওয়া যাচ্ছে। সমস্ত র‍্যাংকিংয়ে 3 এবং 9 সংখ্যা দুটি নেই। এই 3 এবং 9 সংখ্যা দুটি একসঙ্গে নবম ঘরে ছাপা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এটা কি ছাপার ভুল?

—**শ্রীপিণ্টু শীল** Vill + P.o—গাজিপুর জেলা—হাওড়া

## উচ্চমাধ্যমিকের জন্য

মাধ্যমিকে আমাদের সাফল্যের পিছনে আপনার ও আমাদের মনের পত্রিকা 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' এর সহযোগিতা স্বীকার্য!

তাই আমরা চাই আপনার ও আমাদের পত্রিকা আমাদের "উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য বিশেষ কিছু আলোচনা করবে। প্রতি মাসে তার অপেক্ষায় থাকব।

**ভাতাড় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।**

## বিচিত্র গাছপালা

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের এপ্রিল সংখ্যায় আমার লেখা বিচিত্র গাছপালা প্রকাশ হয়েছে। পাতার উপর ফুল গাছ-নাম হেলেঞ্জিয়া হিমালয়িকা কিন্তু ছবির নিচে হিমালয়িকা হেলেঞ্জিকা ছাপা হয়েছে। এটা ঠিক নয়। গাছটির বর্ণনায় নাম ঠিক আছে কেবল ছবির নিচে নামটি ভুল হয়েছে। প্রথমটি হল গণ এটি হবে হেলেঞ্জিয়া পরেরটি প্রজাতি এটি হবে হিমালয়িকা।

**অরবিন্দ ঘোষ,** কোচবিহার 726101

# বিলুপ্ত পাখি ঃ অক এবং সলিটেয়ার

জানুয়ারী '87'র 39 পৃষ্ঠায় চেনা অচেনা পাখি বিভাগে শ্রীযুক্ত রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তীর লেখা 'বিলুপ্ত পাখিরা' রচনাটিতে দেখলাম 'এক সময় রোড্রিগেজ দ্বীপে এই পাখিরা ( অর্থাৎ সলিটেয়ার ) বাস করত'। কিন্তু 1981-তে Canada-তে পাখি নিয়ে গবেষণারত শ্রীযুক্ত রামচন্দ্রন নাম্বিয়ার Science Reporter-এর May 1981 সংখ্যায় Birds Past and Present রচনায় জানিয়েছেন 'The Dodo inhabited Mauritius Island while another group of their relatives—the Solitaires—existed in the Reunion and the Rodrigues Islands ( P. 199 )—অর্থাৎ ডোডো পাখি মরিশাস দ্বীপে থাকত এবং এদেরই নিকট-সম্পর্কযুক্ত অন্য একদল অর্থাৎ সলিটেয়ার থাকত রিইউনিয়ন ও রডরিগজ দ্বীপে। এখানে বলে রাখা ভাল রিইউনিয়ন, রডরিগজ ও মরিশাস দ্বীপকে এক সঙ্গে মাসকারিন দ্বীপপুঞ্জ ( Mascarene Islands ) বলা হয়।

শ্রীযুক্ত নাম্বিয়ারের মতে ডোডো পাখি বিলুপ্ত হয় 1681-তে ও সলিটেয়ার বিলুপ্ত হয় 1746-এ

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর লেখা থেকে জানতে পারি ( 40 পৃষ্ঠা শেষ প্যারা ) 'শূকরেরাই ডোডো পাখির বিলুপ্তি ঘটিয়েছিল'। কিন্তু শ্রীযুক্ত নাম্বিয়ারের লেখা থেকে জানতে পারি ঐ দ্বীপপুঞ্জে পর্তুগীজ ও ডাচ ( ওলন্দাজ ) অধিবাসীরা যেসব গৃহপালিত পশু ( কুকুর এবং বেড়াল ) এনেছিল তারাই 17 শ' শতাব্দীতে এই পাখিদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করেছিল। ওরা এই পাখিদের ডিম খেয়ে ফেলত এবং আত্মরক্ষায় অ ারগ বাচ্চা ও বড় পাখিগুলিকে তাড়া করে মেরে ফেলত'।

শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর লেখায় কোথাও উল্লেখ নেই যে রচনার শীর্ষকের কাছে আঁকা ছবি ডোডো পাখিরই। তা ছাড়া সলিটেয়ার পাখির যে ছবি তাতে দেখা যাচ্ছে পাগুলি উটপাখির মত বড় কিন্তু শ্রীযুক্ত নাম্বিয়ারের রচনার সঙ্গের ছবিটি সে কথা বলে না। ঐ ছবিতে সলিটেয়ারের পা ছোট দেখানো হয়েছে ( বোঝার সুবিধের জন্য ছবি এঁকে দিলাম )।

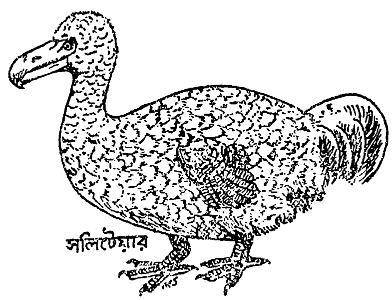


যে ছবির লেবেলে অক পাখি লেখা তা কি ক্ষুদ্র অক পাখির ? হয়তো তাই কিন্তু লেবেলে শুধু 'অক পাখি' লেখা। বৃহৎ অকের ছবি শ্রীযুক্ত নাম্বিয়ারের রচনায় যেমন আছে ( এরও ছবি এঁকে দিলাম ) তার সঙ্গে কিন্তু শ্রীযুক্ত চক্রবর্তীর বিবরণ মিলে যাচ্ছে অর্থাৎ 'দেখতে এরা পেঙ্গুইন পাখির মতো'। প্রসঙ্গতঃ বৃহৎ অকের বিলুপ্তিকাল সম্পর্কে দুজনেই একমত।

**মদনমোহন সামন্ত, 1/99 বিজয়গড়, যাদবপুর, কলকাতা-32।**

## বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা কাল

গত 'মে' 86 সংখ্যায় শ্রী বিমান বসু 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' রচনায় প্রথমে লিখেছেন 1897 সালে জগদীশ চন্দ্রের মনে বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনের প্রেরণা জাগে এবং এর দশ বছর পরে তাঁর স্বপ্ন সফল হয়। একথা অনুযায়ী বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনের সময়কাল হওয়া উচিৎ 1907 খ্রীস্টাব্দ। কিন্তু আবার তিনি লিখেছেন এটি স্থাপিত হয় আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে এবং 1917 সালের 30শে নভেম্বর। কোন বছর বিজ্ঞান মন্দিরের যথার্থ স্থাপনাকাল, জানালে উপকৃত হব। আমার মতে এত জনপ্রিয় ও সুন্দর এই পত্রিকায় এই ধরনের ভুল বাঞ্ছনীয় নয়।

**সন্দিৎসু দাস, প্রযত্নে শ্রীশান্তি দাস, আদরপাড়া, জলপাইগুড়ি**

## মজার গুণফল

গত জুলাই 86 সংখ্যায় 41 পাতায় পড়াশোনা বিভাগে শান্তি নন্দীর 'মজার গুণফল' পড়ে গুণের একটি নতুন পদ্ধতি জেনে উপকৃত হলাম। কিন্তু সব গুণ-গুলির গুণফল প্রকৃত গুণফলের সঙ্গে মিলে গেলেও 207 ও 194 এবং 308 ও 293 এর ক্ষেত্রে প্রকৃত গুণফলের সঙ্গে মিলে না। দেওয়া আছে 207 ও 194-এর গুণফল 400158। কিন্তু প্রকৃত গুণফল 40158, আবার দেওয়া আছে 308 ও 293-এর গুণফল 900-244, কিন্তু প্রকৃত গুণফল 90244। এই পদ্ধতিতে 200-র উপরের কোন সংখ্যার সঙ্গে গুণ করলে গুণফল সঠিক হচ্ছে না। নিয়মটি করবার আগে গুণ-গুলি কি পরীক্ষা করে নেওয়া উচিৎ ছিল না ?

**অজয় চট্টোপাধ্যায়, গ্রাম-আর্যনগর জেলা হুগলী—712412**

## মাদাম কুরী, রেডিয়াম—পলোনিয়াম

জনপ্রিয় 'কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান' পত্রিকার April '86 সংখ্যায় দীপঙ্কর বসুর 'মৌল আবিষ্কারের পেছনে' শীর্ষক রচনায় নিম্নলিখিত তথ্য পরিবেশিত হয়েছে :

(1) ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা 1898 সালে পোলোনিয়াম নামক মৌল আবিষ্কার করেন।

(2) ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা 1804 সালে রেডিয়াম এবং ফ্রান্সের বিজ্ঞানী 1898 সালে রেডিয়াম নামক মৌল আবিষ্কার করেন।

(1) নং তথ্যে-র পরিপ্রেক্ষিতে আমি আর একটি বিজ্ঞান পত্রিকার বক্তব্য নিচে উল্লেখ করলাম ঃ—

'বিজ্ঞান মেলা' পত্রিকার February '83 সংখ্যায় লরাফের্মি ( ভাষান্তর-লুব্ধক) এর 'পরমাণু-শক্তির গল্প' শীর্ষক রচনার 80 পৃষ্ঠায় বাঁদিকের প্রথম থেকে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আছে—"মেরী এবং পিয়ের দুজনেই এতে খুব উৎসাহিত হয়ে পিচব্লেণ্ডের মধ্যে নতুন অজানা তেজস্ক্রিয় পদার্থটি বের করতে চেষ্টা করলেন। কয়েক মাস পর তাঁরা একটি মৌলের সন্ধান পেলেন। জন্মভূমি পোল্যাণ্ডের নামে মেরী তার নাম দিলেন 'পোলোনিয়াম' "।

এখন আমার প্রশ্ন 'পোলোনিয়াম' মৌলটির আবিষ্কারক কোন দেশ ? পোল্যাণ্ড না ফ্রান্স ?

(2) নং তথ্যের পেরিপ্রেক্ষিতে আমার প্রশ্ন কোনটি রেডিয়াম ( Radium ) এবং কোনটি রোডিয়াম ( Rhodium ) দু' জায়গাতেই ভুলবশতঃ রেডিয়াম ছাপা হয়েছে।

**মনোমোহন টুডু**, 1B/2 হর্ষবর্ধন রোড, দুর্গাপুর-4, বর্ধমান।

জানুয়ারী '87 সংখ্যায় "কুরী এবং রেডিয়াম" রচনাটি পড়ে মেরী কুরী সম্বন্ধে জানতে পারলাম।

কিন্তু রেডিয়াম আবিষ্কার সম্পর্কে জানতে পারি নাই। কারণ লেখক কুরী দম্পতির ল্যাবরেটরী বা চালাঘরের যন্ত্রপাতির বর্ণনা দিয়েছেন শেষের উপরের অনুচ্ছেদে। এবং তারপরেই মেরী কুরী ঘোষণা করলেন যে, তিনি পিচব্লেণ্ড থেকে "পলোনিয়াম" নামক একটি ধাতু আবিষ্কার করেছেন। এবং তারপর প্রচণ্ড নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণা করে আবিষ্কার করলেন রেডিয়াম। কুরী দম্পতি 1898 থেকে 1902 সাল পর্যন্ত যে মূল্যবান ধাতু আবিষ্কার করলেন, সেই ধাতুর আবিষ্কার বা কর্মপদ্ধতি আলোচনা করেননি। রেডিয়াম আবিষ্কার পদ্ধতি লিখলে রচনাটি পড়ে আমরা আরো জ্ঞান অর্জন করতে পারতাম।

ইউরেনিয়াম ও রেডিয়াম মূল্যবান ধাতু দুটি আমাদের কি কি কাজে লাগে তা জানালে ভাল হত।

**অসীম কুমার পাল**, গংগারামপুর, পশ্চিম দিনাজপুর।

### ভ্রম সংশোধন

ফেব্রুয়ারি 87 সংখ্যা কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রকাশিত আমার দুটি চিঠিতেই কিছু মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে। প্রথম চিঠিতে ছাপা হয়েছে ঃ "Papyrus-এর উচ্চারণ প্যাপিরাস নয়, প্যাপাইরাস।" একেবারে উল্টো। উচ্চারণ প্যাপিরাস Papyrus "প্যাপাইরাস নয়" লিখেছিলাম। দ্বিতীয় চিঠিতে ছাপা হয়েছে ঃ বৃহস্পতিরও অনুরূপ বলয়ের অস্তিত্ব জানা গেছে।" বৃহস্পতির নয়, ইউরেনাসের বলয়ের সংখ্যা মোট নটি। চিঠির শেষ শব্দটি "করলেন" নয়, "করেন।"

**সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ** 37/1 গোরাচাঁদ রোড কলকাতা—14

## পৃথিবীর বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ

ফেব্রুয়ারী' 87 সংখ্যার 'কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান' পত্রিকার জ্ঞান বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ শীর্ষক লেখায় শ্রদ্ধেয় বরুণ মজুমদারের কলমে পড়লাম "জাপানে দীর্ঘ 120 বছর ধরে বেঁচে 1986 সালের 21 ফেব্রুয়ারী মারা গেছেন...... পৃথিবীর সবচেয়ে দীর্ঘজীবী মানুষ হিসাবে গিনিস বুক অফ ওয়ারল্ড কোর্সে তাঁর নাম ( শিগেচিও ইজুমীর ) ছাপা হয়েছে।" আমি এই বইটি পড়িনি তবে আমার মনে হচ্ছে তথ্যটি ভুল। যে কারণে তথ্যটি ভুল বলছি তা সপ্রমাণ করার মতো হাতে নাতে যুক্তি আমার কাছে নেই। তাই কিশোর পাঠক পাঠিকা বন্ধুদের কাছে এটি তুলে ধরছি। 1983 কিংবা '84 সালের কোন এক বৃহস্পতি বার আকাশবাণী কলকাতা থেকে প্রচারিত বিচিত্র সংবাদ এ শুনেছিলাম পৃথিবীর বয়স্কতম ব্যক্তিটির বাস ভারতেই। রাই বেরিলী সংসদীয় কেন্দ্রের অন্তর্গত কোন গ্রামে তাঁর বাস। তিনি স্বচক্ষে সিপাহী বিদ্রোহ দেখেছেন ( তখন তাঁর বয়স 16/17 )। খবর প্রচারের সময় তিনি সোজাভাবে দৈনিক 1 কিমি হেঁটে যাতায়াত করতে পারতেন। এই হিসেব মতো এখন তাঁর বয়স ( যদি বেঁচে থাকেন এখনও ) 147 বছর। পত্রিকার পক্ষ থেকে বরুণ বাবু কিংবা অন্য কেউ তথ্যটি সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবেন কি ?

**সুতপা বায়েন, দশম** শ্রেণী, কাঁথি হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়, মেদিনীপুর।

## ইউক্লিডের জ্যামিতি প্রসঙ্গে

"ইউক্লিডের জ্যামিতি প্রসঙ্গে"র লেখক ইন্দ্রনীল ঘোষের রচনার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা সহ অসংখ্য চিঠি দপ্তরে এসেছে। আগামী সংখ্যায় সেইসব চিঠি প্রকাশিত হবে।

**—সম্পাদক**

# একবার ভেবে দেখবেন!

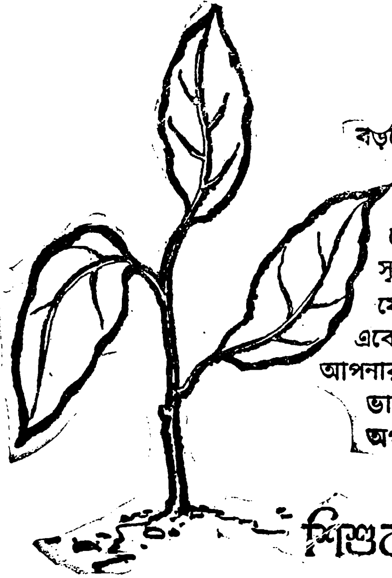

বড়দের অনুকরণ করা শিশুদের সহজাত প্রবৃত্তি। তা সে ভালো, মন্দ যাই হোক না কেন। কাজেই আমাদের যে কোন অন্যায় কাজ-সে যত তুচ্ছই হোক-শিশুমনে দারুন প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে।

যেমন ধরুন "ট্রেনের টিকিট না কাটা" একে তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দেবেন না, কারণ আপনার বাড়ির শিশুরাও তাহলে একে তুচ্ছ বলেই ভাবতে শিখবে। ফলে তৈরি হয়ে যাবে বৃহত্তর অপরাধের বুনিয়াদ।

## শিশুবৃক্ষকে বিষবৃক্ষে পরিণত হতে দেবেন না

**বিনা টিকিটে রেলভ্রমণ সামাজিক অপরাধ**

**পূর্ব রেলওয়ে**



K.J.B./April 87/2

# লালের জোয়ার যেখানে

## সমরজিৎ কর

লস অ্যাঞ্জেলেস বিমান বন্দর থেকে আকাশে উঠে কোন বিমান যখন নিউইয়র্কের পথে বাঁক নেয় বিমান থেকে নিচের দিকে চাইলেই তখন চোখে পড়বে সান্তা মনিকা উপসাগর। চোখে পড়বে সেই উপসাগরের বুকে অজস্র সাদা সাদা ফুটকি। সাদা পাল তোলা মোটর বোটগুলি ঠিক অমনিই দেখায়। আর জল? দূর থেকে সমুদ্রের জলকে তো দেখায় নীল? কিন্তু এ ক্ষেত্রে? না। সান্তা মনিকা উপসাগরের জল লাল। যেন মনে হয়, সে জলে কেউ যেন রক্ত গুলে রেখেছে। সব জায়গায় নয়, মাঝে মাঝে। বিজ্ঞানীরা এই অংশগুলির নাম রেখেছেন 'লাল জোয়ার'। তবে সাধারণ অর্থে জোয়ার বলতে যা বোঝায় তা অবশ্য নয়। এক ধরনের খুদে খুদে জীবাণুই সেই জায়গাগুলি করে তোলে লাল। রক্তের মত লাল। এই লাল জোয়ার সাধারণ জোয়ারের মত যে একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর দেখা যাবে, তাও নয়। কখন দেখা যাবে, সে কথাও বলা শক্ত। বছরে কখনো একবার, কখনো দুইবার। কখনো বা দুই বছর অন্তর। এ ধরনের দৃশ্য দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূল অঞ্চলে গ্রীষ্মের শেষে চোখে পড়ে। কখনো বা শীতের সময়। কয়েক দিন ঝড়ো বাতাস বইলেই তারা অদৃশ্য হয়। অর্থাৎ ওই জীবাণুরা। তখন সমুদ্রের জল ফিরে পায় তার স্বাভাবিক বর্ণ—নীল।

বিজ্ঞানীরা ওই সব জীবাণুর ব্যাপারে অনুসন্ধান চালিয়ে নানারকম অদ্ভুত তথ্যও আবিষ্কার করেছেন। অণুবীক্ষণের সাহায্যে পরীক্ষা করে জানা গেছে, তারা এক-কোষী জীব। তাদের উদ্ভিদও বলা চলে না, আবার প্রাণীও বলা যায় না। উদ্ভিদের মত তাদেরও রয়েছে ক্লোরোপ্লাস্ট। 'ক্লোরোপ্লাস্টের সাহায্যে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় তারা শর্করা উৎপাদন করে। তবে স্থলভাগের উদ্ভিদের ক্লোরো-প্লাস্টের বর্ণ সবুজ, তাদের ক্লোরোপ্লাস্টের বই গোলাপী বা হলদেটে। আবার লাল জোয়ারের এই জীবরা নিজেদের ক্ষমতা ব্যবহার করে প্রাণীদের মত চলাচলও করতে পারে। তাদের আয়তন খুবই ক্ষুদ্র। চার আউন্স জলে দশ লক্ষের মত বাস করতে পারে। বিজ্ঞানীরা এটাও দেখেছেন এক একটি অঞ্চলে এক প্রজাতির প্রাণীই পাওয়া যায়।

দেখা গেছে, বেশির ভাগ লাল জোয়ারে প্রাণীর দেহের সঙ্গে জুড়ে থাকে চাবুকের মত দুটি প্রত্যঙ্গ। একটি পেটের নিচে। চলাফেরার সময় এটি এপাশ ওপাশ বিক্ষিপ্ত হয়। অপরটি থাকে আর এক পাশে। এটি ওই প্রাণীর দেহের মাঝ বরাবর চক্রাকারে ঘোরে। আরো একটি ব্যাপার। বেশির ভাগ লাল জোয়ারে প্রাণী সূর্যের দৃশ্যমান আলোর স্পর্শে জল এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে তৈরি করে তাদের খাদ্য। এ ছাড়াও তাদের দেহের গঠনটিও বড় বৈচিত্র্যপূর্ণ। শিং-এর মত প্রত্যঙ্গ, খুদে খুদে কাঁটা, গায়ের পাশ দিয়ে নেমে এসেছে ঝালর—সে যেন এক অপূর্ব শিল্পকলা।

পৃথিবীর বিভিন্ন সমুদ্রাঞ্চলেই লাল জোয়ার দেখা যায়। এবং অঞ্চল বিশেষে প্রাণীরাও ভিন্নতর হয়ে থাকে। যেমন ধরো, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার সমুদ্রাঞ্চল। এই অঞ্চলে 'লাল জোয়ারে' প্রাণী দেখা যায় তাদের বৈজ্ঞানিক নাম গনিয়লাক্স পলিয়েড্রা (Gonyaulax polyedra)। এক-কোষী এই প্রাণী দেখতে মোটামুটিভাবে গোলাকার। এক একটির ব্যাস 45 মাইক্রোন (1 মাক্রোন 1 মিটারের দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ)। চাবুকের মত প্রত্যঙ্গের সাহায্যে এরা জল ঠেলে প্রতি সেকেণ্ডে 300 মাইক্রোনের মত দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। এ ধরনের প্রাণী সামান্য পরিমাণে বছরের সব সময়ই জলে থাকে। কম সংখ্যক হওয়ায় চোখে পড়ে না। তারপর হঠাৎ দেখা গেল এক সময় তাদের দ্রুত বংশ বৃদ্ধি হতে শুরু করেছে। কেন, সে রহস্য এখনো জানা যায় নি। যখন বংশ বৃদ্ধি শুরু হয় তখন সমুদ্র উপকূলের সমান্তরাল বরাবর জলের রঙ পালটায়। যেন জলের উপর এঁকে রয়েছে কয়েক ফালি লাল আস্তরণ। তার পর, দিনে দিনে সেই আস্তরন দ্রুত বাড়তে থাকে। বিস্তৃত হয় সমুদ্রের ব্যাপক এলাকা জুড়ে। সূর্য ওঠার পর কয়েক ঘণ্টা ধরে ওই জীবাণু সমৃদ্ধ লাল আস্তরন বা 'লাল জোয়ার' কয়েক ঘণ্টা ধরে দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সূর্যের আলোর স্পর্শ পেলে তারা জলের অগভীর অঞ্চল থেকে উপরের দিকে উঠে আসে। রাতের দিকে জলের নিচে ডুব দেয়।

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার সমুদ্রাঞ্চলে গনিয়লাক্স পলিয়েড্রা ছাড়াও আর এক ধরনের লাল জোয়ার সৃষ্টিকারী প্রাণী দেখা যায়। নাম প্ররোসেণ্ট্রাম (Prorocentrum)। এরা দেখতে পাতার মত। গোলাপী রঙ। আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে দেখা যায় আর এক ধরনের প্রাণী—জিমনোডিনিয়াম (Gymno-dinium)। এদের রঙ রক্তের মত লাল। সমুদ্রের অনেকটা অঞ্চল এরা এমন ভাবে ঢেকে রাখে, হঠাৎ দেখলে

মনে হয় সমুদ্রের উপর কে যেন ছড়িয়ে রেখেছে আবীরের স্তর। সূর্যের আলো সেই স্তর ভেদ করে জলের মাত্র কয়েক সেণ্টিমিটার নিচে প্রবেশ করতে পারে।

গ্রীষ্মপ্রধান সমুদ্রাঞ্চলে দেখা যায় আর এক ধরনের জীব ট্রাইকোডেসমিয়াম ( Trichodesmium )। এদের দেহে চাবুকের মত প্রত্যঙ্গ থাকে না। পরিবর্তে থাকে সূক্ষ্ম সুতোর মত প্রত্যঙ্গ। এরা উদ্ভিদ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে। এরা প্রত্যঙ্গের সাহায্যে সাঁতার কাটতে পারে। বাতাস থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে তৈরি করতে পারে অ্যামিনো অ্যাসিড—তাদের খাদ্য। এরা এক ধরনের লালচে-সবুজ শৈবাল। এদের গায়ে থাকে লাল লাল ফুটকি। এই ফুটকির জন্যে জলের বর্ণ হয় লাল। এক ধরনের জীবাণু।

হয়ত ভাববে, তা না হয় হলো—নীল সমুদ্রের বুকে মাঝে মাঝে ওই সব জীবাণু যদি রঙের বাহার সৃষ্টি করে ভালই তো। তাতে দেখার এক ঘেঁয়েমিটা কাটবে।

কথাটা ঠিক, তবে একটি সমস্যার কথাও বলি। ওই সব প্রাণী মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক কম নয়। যেমন ধরো গনিয়লাক্স এক্সকাভাটা ( Gonyaulax excavata )। এই প্রাণীর দেহ থেকে নিঃসৃত হয় এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ। অত্যন্ত বিষাক্ত। এ সব প্রাণী ঝিনুক, শামুক প্রভৃতির খাদ্য। ওই বিষ তাদের কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু মানুষের পক্ষে খুবই মারাত্মক। অনেকে ঝিনুক শামুক খায়। অতএব তাদের বিপদ। শামুক ঝিনুকের মাধ্যমে ওই বিষ মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে মানুষের স্নায়ু দুর্বল হয়। স্নায়ুর ভেতর দিয়ে যে সংকেত যাতায়াত করে তা বিঘ্নিত হয়। এতে করে মৃত্যুও ঘটতে পারে। কোন কোন অঞ্চলে এ ধরনের বিষ মাছের মাধ্যমেও মানুষের দেহে পৌঁছায়। অতএব, বলা চলে 'লাল জোয়ার' দেখতে ভাল হতে পারে, তাই বলে তার বিপজ্জনক দিকটি তো আর অস্বীকার করতে পার না।

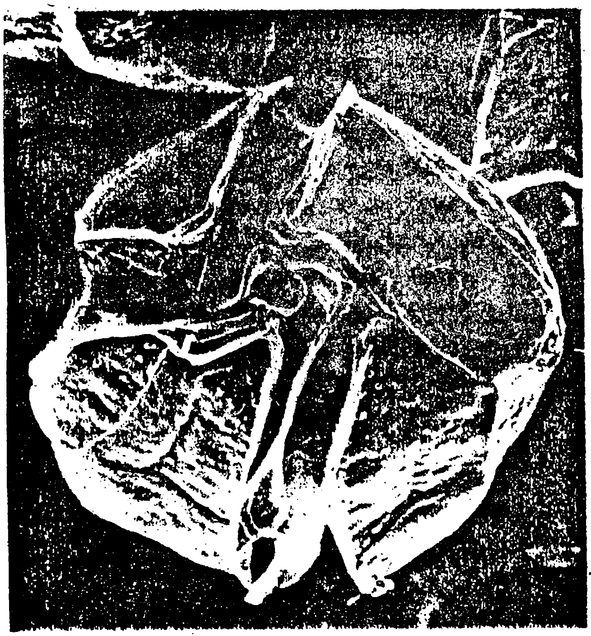

গ্যাদিয়লাক্স এক্সকাভেটা


কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার ষষ্ঠ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকা, শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ এবং

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত

# বিজ্ঞান সমাবেশ

স্থান : মহাবোধি সোসাইটি হল। সময় : 18ই এপ্রিল শনিবার বিকাল 5টা

## অনুষ্ঠান সূচী

- আলোচনা : বিজ্ঞান ও শিশু সাহিত্য
- কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত মডেল প্রতিযোগিতা
- রণজিৎ-স্মৃতি পুরস্কার ও কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পুরস্কার অর্পণ
- সফল প্রতিযোগীদের সার্টিফিকেট ও পুরস্কার অর্পণ

আমন্ত্রণ পত্র দপ্তর থেকে সংগ্রহ করতে হবে ॥ অনিবার্য কারণে সময় ও তারিখ পরিবর্তন হতে পারে

# জ্ঞান বিজ্ঞানের বিচিত্র সংবাদ

### বরুণ মজুমদার

## সাপের বিষ, হৃদরোগের ওষুধ

সাপ দেখে ভয় পেয়ে কেউ কেউ হৃদরোগে আক্রান্ত হতে পারেন, আবার এই সাপের বিষ থেকে হৃদরোগের ওষুধ তৈরি হতে পারে। সুতরাং যে সাপ হৃদরোগের কারণ সেই বিষধর সাপের বিষ হৃদরোগ সারাতে সক্ষম। নতুন দিল্লীর মৌলানা আজাদ মেডিকেল কলেজের ডাঃ শ্রীবাস এই কথাই জানিয়েছেন। তিনি নিজে পরীক্ষা করে একথা বলেছেন। তাই এখন হৃদরোগের বিকল্প ওষুধ হিসাবে সাপের বিষ ব্যবহার করার কথা ভাবা হচ্ছে। বিষধর সাপ মানুষকে কামড়ালে তার বিষের জ্বালায় মানুষ মরে যায় একথা আমরা এতদিন শুনে এসেছি। তাই সাপ যেমন মানুষের জীবন নিতে পারে তেমনি এই সাপই আবার মানুষকে রোগমুক্তির সন্ধান দিতে পারে। হৃদরোগের ওষুধ হিসাবে সাপের বিষ ব্যবহার করে ভাল ফল পাওয়া গেছে। এই ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাকি খুব কম।

## খুনী বন্দী—দামী ডাক্তার

সততা আর নিষ্ঠা থাকলে কোনো মানুষ যে সত্যি সত্যি জীবনে উন্নতি করতে পারে এটা আমরা অনেকেই জানি। কোনো মানুষের মধ্যে সততা থাকলে সত্যের কষ্টি-পাথরে সে নিজেকে যাচাই করে নিতে পারে। থাঞ্জাভুরের এক যুবক ডাঃ সুন্দরম তা প্রমাণ করেছেন। তাকে এখন ডাক্তার বলছি বটে, কিন্তু আগে তিনি ডাক্তার ছিলেন না, তার পরিচয় ছিল একজন খুনী যুবক হিসাবে। ভ্রাতৃহত্যার দায়ে 1974 সালে সুন্দরমের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। কারাগারে বন্দীর জীবনযাপন করতে করতে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত সে মনোযোগ দিয়ে জেলের মধ্যেই পড়শুনা শুরু করলো। নিজের আন্তরিক চেষ্টা আর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল ফললো। সুন্দরম ডাক্তারী পরীক্ষা অর্থাৎ এম. বি. বি. এস পরীক্ষায় পাশ করলো। এরপর ইন্টার্নিশীপ করতে হয়। মাদ্রাজ সেন্ট্রাল জেলেই সে ইন্টার্নিশীপ করলো।

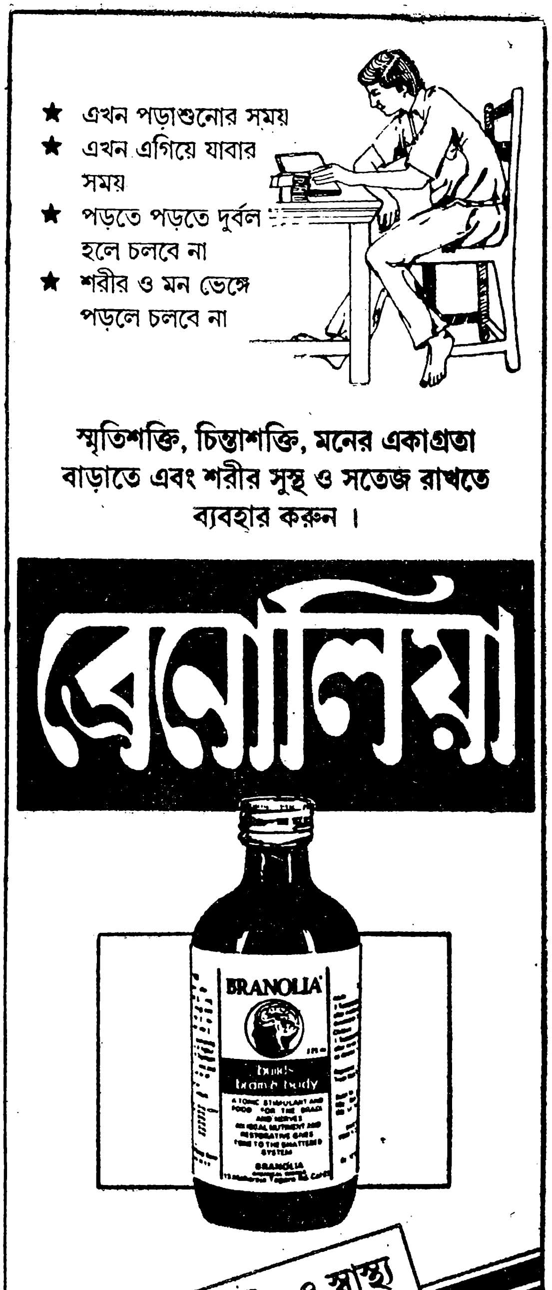

রঙ্গন ফুলগাছটি ছোট গুল্ম বিশেষ বা কখনও ছোট বৃক্ষ হয়। এই ফুলগাছটি যত্রতত্র দেখা যায়। বিশেষ করে এই ফুল গাছটির শাখার প্রান্তে উজ্জ্বল রঙের থোকা থোকা ফুল, তার সঙ্গে চকচকে সবুজ পাতা সহজেই সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেয়। তাই বাগানবিলাসীদের কাছে প্রিয় ফুলগাছ।

রঙ্গন ফুলগাছটির অনেকগুলি প্রজাতি আছে। কোনটি আকৃতিগত পার্থক্য, আবার কোনটির রঙ টকটকে লাল,

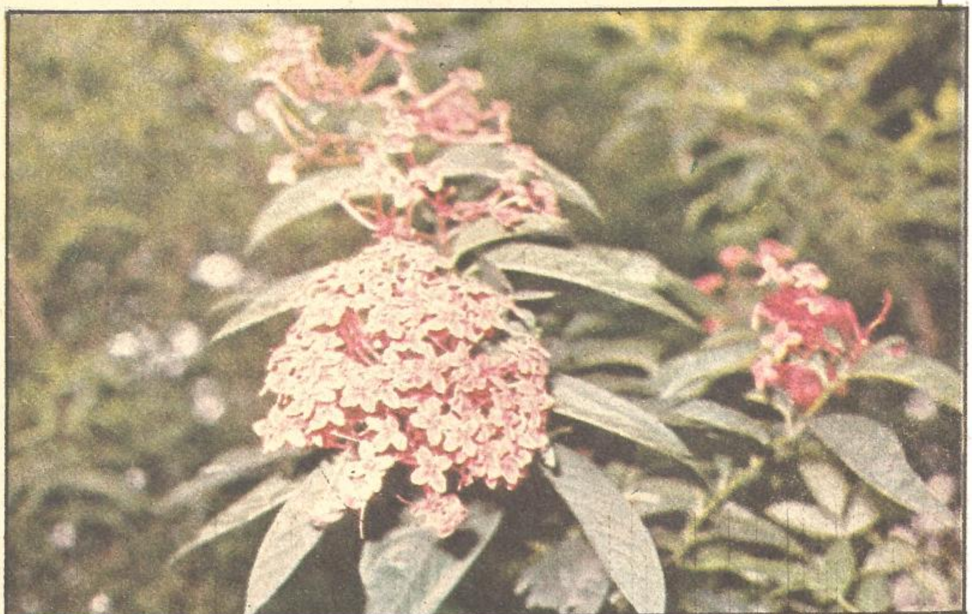

★ রঙ্গন ★

ফটোঃ সুবলকৃষ্ণ দে।

গোলাপী, সাদা, হলুদ বা কমলা ইত্যাদি। এর মধ্যে লাল রঙের রঙ্গনফুল সর্বত্রই দেখা যায়। অন্য রঙের রঙ্গন ফুলগাছের সংখ্যা খুবই কম। বিভিন্ন উদ্যানগুলিতে যেমন বিধান শিশু উদ্যান, যতীন্দ্রমোহন পার্ক, কার্জন পার্ক, হৃষীকেশ পার্ক, আলিপুর হর্টিকালচার ইত্যাদি বাগানগুলিতে শোভা বিস্তার করে। এই ফুলগাছটির ওপর বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা যেমন cross breeding, mutation breeding ইত্যাদি করার ফলে অনেক প্রজাতি ও ভ্যারাইটির জন্ম হয়েছে। তাই রঙ্গন ফুলের প্রজাতি একনজরে দেখে বলা মুস্কিল হয়। ছবিতে রঙ্গন ফুলগাছটির বৈজ্ঞানিক নামকরণ Ixora rosea wall. Van Rheede লিখেছেন এই রঙ্গন ফুল মালাবার দ্বীপের দেবতা 'ইকভারা'কে উৎসর্গ করা হত। তাই থেকেই এই ফুলগাছটির গণের নাম ইকসোরা হয়। ফুলের রঙ গোলাপী বলে প্রজাতির নাম রোসিয়া হয়েছে। ইংরাজীতে পিক ইকসোরা ও বাংলায় গোলাপী রঙ্গন নামে পরিচিত। ইহা রুবিয়েসী গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। উদ্ভিদবিজ্ঞানী রক্সবার্গের মতে এই উদ্ভিদটির আদিনিবাস মালাক্কা এবং চীন। এখন ভারতের সর্বত্রই হয়। এই ফুলগাছটিতে সারা বছরই ফুল হয়। তবে বর্ষাকালে ফুলের প্রাচুর্য থাকে।

এই ফুলগাছটির বিভিন্ন প্রজাতি বিভিন্ন উচ্চতায় হয়। পাতা অভিমুখ, উপ-ডিম্বাকার, সূক্ষ্মাগ্র, নিচের দিকটা কিছুটা গোলাকার, পাতার উপরিতল চকচকে সবুজ, নিচের তল ফ্যাকাসে সবুজ। উপপত্র বর্তমান দুই পত্রবৃন্তের মধ্যবর্তী স্থানে।

পুষ্পবিন্যাস কোরিম্ব। এই ধরনের পুষ্পবিন্যাসে পুষ্পদণ্ডযুক্ত এবং মঞ্জরী পত্রাবরণের ওপর উপস্থাপিত থাকে। ফুল সবৃন্তক কিন্তু বৃন্তগুলি অসমান হয় তবে একই তলে থাকে। দলমণ্ডল রঙ্গনাকার অর্থাৎ অনেকটা চক্রাকারের মত। কিন্তু দলনল লম্বা হয়। ইহা সমাঙ্গ যুক্ত দল বিশিষ্ট ফুল। দল চারটি পাঁপড়িতে বিভক্ত থাকে। পুংস্তবক চারটি ; পুংদণ্ডগুলি দুটি পাঁপড়ির মধ্যবর্তী দলনলের অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। গর্ভস্তবকের গর্ভাশয় দুই কোষ যুক্ত এবং ডিম্বক প্রতি কোষে একটি থাকে। এই ফুলগাছটির বীজ ও কাটিং দ্বারা বর্ষাকালে বৃদ্ধি পায়।

এণাক্ষী বিশ্বাস

# সিনিয়র

## ক্যুইজ কনটেস্ট এপ্রিল 1987 মান : IX—X

1. দশম এশিয়ান গেম্‌স কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ?
2. ভারতের কোন্‌ রাজ্যে 'গিড্ডা' নাচ প্রচলিত ?
3. ঘানার আগেকার নাম কি ছিল ?
4. কামাখ্যা পাহাড় কোথায় অবস্থিত ?
5. মানুষ প্রথম কোন্‌ ধাতু ব্যবহার করে ?
6. কোন্‌ মৌলের পরমাণু ক্রমাংক 42 ?
7. 'নিয়ন' গ্যাসের আবিষ্কর্তার নাম কি ?
8. স্পঞ্জ কোন্‌ গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণী ?
9. এক আলোক বর্ষ = কতো কিলোমিটার ?
10. মানুষের কতগুলি পঞ্জরাস্থি ( Rib ) থাকে ?
11. 'সিডেরাইট' কোন্‌ ধাতুর আকরিক ?
12. কোন্‌ খেলায় সবচেয়ে বড় মাঠের প্রয়োজন হয়।

## ফটো ক্যুইজ

**এপ্রিল 1987 মান : IX—X**

এই বিচিত্র দর্শন প্রাণীটির নাম কি ?

### আই-কিউ-টেস্ট—এপ্রিল '87

1. হিমশৈলের ( iceberg ) কতটুকু অংশ জলের বাইরে থাকে ?

2. হোয়াইট হাউসে প্রথম কোন রাষ্ট্রপতি বাস করেছিলেন ?

(a) জর্জ ওয়াশিংটন, (b) জন অ্যাডাম্‌স

(c) আব্রাহামলিঙ্কন

3. নিচের কোনটি প্রাকৃতিক পলিমার ?

(a) বেকেলাইট, (b) পলিথিন, (c) রাবার।

4. 5টি বিন্দু দেওয়া আছে। যাতে প্রত্যেকটি সরলরেখা অন্তত দুটি বিন্দু দিয়ে যায় এরকম সবচেয়ে বেশি যতগুলি সরলরেখা আঁকা সম্ভব তা হলো—

(a) 8, (b) 9, (c) 10, (d) এদের কোনটিই নয়।

### ফেব্রুয়ারি '87তে প্রকাশিত সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সমাধান

1. স্টকহোম। 2. শ্যাম দেশ। 3. জন্‌ অ্যাডামস্‌। 4. সম্রাট অশোক। 5. 1912 খৃীস্টাব্দে। 6. স্বরূপিনী দেবী। 7. আমেদাবাদের ধরমগাঁও নামক স্থানে। 8. আমেরিকান যন্ত্রবিদ J. W. Rabel. 9. Anti Tetanus Serum. 10. হরিনাথ দে ছিলেন বিখ্যাত ভাষাবিদ। 11. জার্লিনা। 12. মেগাস্থিনিস।

**ফেব্রুয়ারি সংখ্যার ফটো ক্যুইজের সমাধান :**

**হুপিং ক্রেন**

# জুনিয়র

## ক্যুইজ কনটেস্ট এপ্রিল 1987 মান : VI—VIII

1. স্ট্যাচু অফ লিবার্টি কোথায় অবস্থিত ?
2. কোন দেশে সবচেয়ে বেশি তামাক উৎপন্ন হয় ?
3. ভারতের জাতীয় ফুল কোন্‌টি ?
4. নিউজিল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসীদের কি বলা হয় ?
5. নিচের কোন্‌টি বীজ থেকে জন্মে না ?
(ক) ফুলকপি (খ) বেগুন (গ) আলু
6. একটি 'শাটল কক্' এ কয়টি পালক থাকে ?
7. 'পঞ্চতন্ত্র' রচনা করেছিলেন কোন্ পণ্ডিত ?
8. ভারতের কোন্ রাজ্যে সম্বর হ্রদ অবস্থিত ?
9. 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসটি কার লেখা ?
10. পাগলা কুকুরে কামড়ালে কোন্ রোগ হয় ?
11. এক সমকোণ = কতো রেডিয়ান ?
12. কোন্ সালে বসু বিজ্ঞান মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় ?

## ফেব্রুয়ারী '87 আই-কিউ-টেস্ট এর সমাধান

1. 4 ঘণ্টা 2. (a) Returned Letter Office (b) European Common Market (c) Internationl Bank for Reconstruction and Development (d) Contral Intelligence Ageney (e) Palestine Liberation Organisation

3. (d) সমস্ত রকমের যান্ত্রিক তরঙ্গ, যেমন শব্দ, দড়ির দৈর্ঘ্য বরাবর কম্পন, জলের উপর ঢেউয়ের বিস্তার প্রভৃতির মতো যেগুলির জন্য জড় মাধ্যমের প্রয়োজন হয় সেগুলির ক্ষেত্রে মাধ্যমের কণাগুলির নিজ নিজ সাম্য অবস্থার সাপেক্ষে কম্পিত হয়। কেবলমাত্র তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ (যা যান্ত্রিক তরঙ্গ নয়) জড় মাধ্যম ছাড়া শূন্য স্থানের মধ্য দিয়েও যেতে পারে।

4. $C^{14}$

5. (b) ফ্লোরিন

## ফটো ক্যুইজ

এপ্রিল 1987 মান : VI—VIII

প্রায় বিরল এই প্রাণীটি প্রধানতঃ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশেই দেখতে পাওয়া যায়। প্রাণীটির নাম বলো ত ?

## ফেব্রুয়ারী '87তে প্রকাশিত জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট এর সমাধান

1. মহাকবি কালিদাস। 2. কোষ দেহ (cell body)। 3. পারস্যের এক বিখ্যাত কবি। 4. (খ) চন্দ্র। 5. পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে। 6. 22শে সেপ্টেম্বর। 7. উষ্ণমণ্ডল। 8. আলকাতরা হ'তে পাওয়া জৈব যৌগ 'টলুইন'। 9. একটি মূলহীন উদ্ভিদের নাম 'জল ঝাঁঝি'। 10. 'টাইকো ব্রাহে' ডেনমার্ক দেশীয় এক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ছিলেন। 11. Oil and Natural Gas Commission. 12. ফরিদ খাঁ।

**ফেব্রুয়ারী সংখ্যার ফটো ক্যুইজের সমাধান :**
**ডঃ নিকোলাস ক্লোয়েমবারজেন**

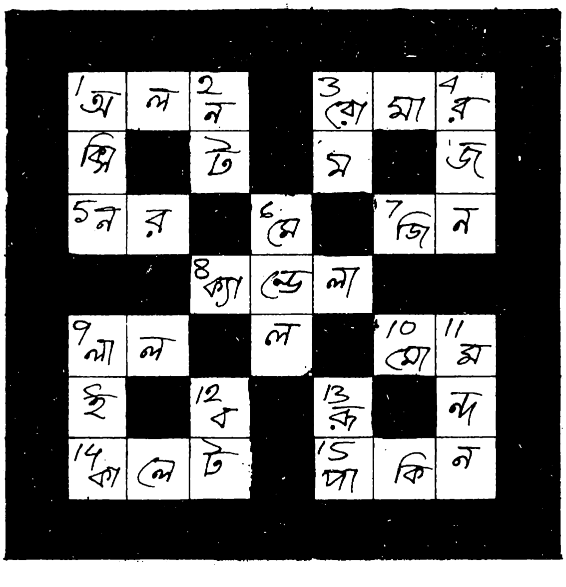

# দীর্ঘায়ু বৃক্ষ রেডউড

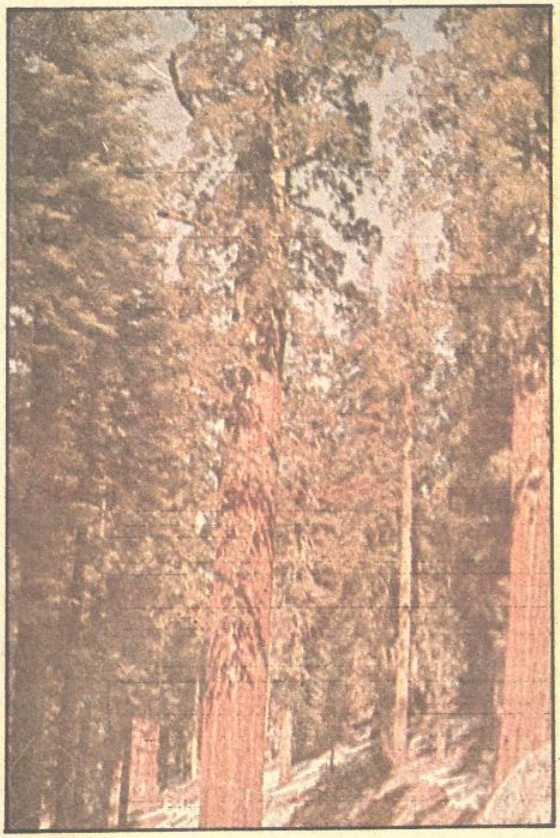

পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘায়ু বৃক্ষ হল ক্যালিফোর্নিয়ার রেডউড অরণ্যের রেডউড বৃক্ষ, বৈজ্ঞানিক নাম সেকোয়া জাইগানসিয়া। রেডউড অরণ্যের মধ্যে এদের দূর থেকে দেখলে মনে হবে যেন একটা বিরাট সবুজ সামিয়ানার ভার বহন করে রয়েছে পর পর সারি সারি লাল স্তম্ভ। এদের কারো কারো বয়স দু' হাজার থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর, অর্থাৎ যীশুখৃস্টের জন্মের সময়ও এরা উপস্থিত ছিল। শুধু বয়সে নয় দৈর্ঘ্যেও এরা পৃথিবীর মধ্যে সেরা, প্রায় সাড়ে তিনশ ফুটের ওপর লম্বা। পৃথিবীর মধ্যে এরাই প্রাচীনতম ও বৃহত্তম জীবিত জীব। উদ্ভিদ জগতের অবিস্মরণীয় এই অতিবৃদ্ধ বৃক্ষদের বয়স জানা যায় কি করে? গ্রীষ্মকালে গাছের দ্রুত বৃদ্ধি ও শীতকালে বৃদ্ধি হ্রাসের ফলে গাছের গুঁড়িতে কতকগুলি ঐক্যকেন্দ্রিক রিং বা গোল গোল দাগের সৃষ্টি হয়। এই রিংগুলি গণনা করে গাছের বয়স জানা যেতে পারে। এছাড়াও অবশ্য অন্য পদ্ধতি আছে।

তবে ভাবতে অবাক লাগে পৃথিবীর ইতিহাসের বহু উত্থানপতনের নীরব সাক্ষী এই বৃক্ষগুলির পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া ও আপদ-বিপদ থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখার ক্ষমতা কতো বেশি। এদের দীর্ঘ আয়ুষ্কালের পেছনে লুকিয়ে আছে নানা জন্মগত বৈশিষ্ট্য। যেমন প্রচণ্ড রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা, বিশেষ করে বৃহৎ বৃক্ষের পরম শত্রু 'উড-রট ছত্রাকের' কবল থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখবার যোগ্যতা। এদের তাই রোগভোগে কাবু করা মুশকিল। দাবাগ্নি বৃক্ষের আর একটি ভয়ঙ্কর শত্রু। অরণ্যের পর অরণ্য এই দাবানলে উজাড় হয়ে যায়। তবে এই দুর্ঘটনাকে মোকাবিলা করতেও এরা প্রস্তুত। এদের গাছের ছাল খুব পুরু এবং পাকা পোক্ত, প্রায় দু' ফুটের ওপর পুরু। তাই অগ্নিদেব সহজে এদের কাবু করতে পারে না।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল দীর্ঘ তিন হাজার বছর ধরে অরণ্যের একই মাটি থেকে অতি বিপুল পরিমাণ সার ও জল শোষণ করলেও ঐ মাটির উর্বরা শক্তি আজও বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। তার কারণ কি?— তার মূল কারণ হল, মাটি থেকে এরা যে বিপুল সার নিয়েছে তার প্রায় সবটাই আবার মাটিতে ফিরিয়ে দিয়েছে ঝরে পড়া ডালপাতার মাধ্যমে। কোটি কোটি বছর ধরে অরণ্য এই ভাবেই নিজেকে রক্ষা করে থাকে। অরণ্যের মাটির উর্বরতা শক্তি রক্ষায় এই ঝরাপাতার ভূমিকা তাই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

***

তারকমোহন দাস ও সীমা সেন

# মোটর গাড়ীর ব্যাটারী চার্জার-কাম-ব্যাটারী এলিমিনেটর

পার্থসারথি চক্রবর্তী

তোমরা নিশ্চয়ই ড্রাই সেল ব্যাটারী এবং নিকেল-ক্যাডমিয়াম সেল ( cell )-এর সাহায্যে ব্যাটারী চার্জ করার বহু সার্কিটের সঙ্গে পরিচিত। এখানে ভারী মজার একটা সার্কিটের কথা বলা হচ্ছে যার সাহায্যে তুমি মোটর গাড়ির ব্যাটারী চার্জ করতে পারবে অতি সহজেই। এই সার্কিট তৈরি করা খুব ব্যয়সাপেক্ষ ব্যাপারও নয়। তোমার চাই কিছু সময় ও ধৈর্য। এছাড়া প্রয়োজন মনে হলে তোমরা এই সার্কিট তৈরির জন্য বড়দের কারও পরামর্শও নিতে পার।

মোটর গাড়ির ব্যাটারীতে চার্জ করবার জন্য higher কারেণ্ট চাই। তাই এটা করতে হলে তোমার একটা 12V 5 অ্যাম্পিয়ার ট্রান্সফরমার ব্যবহার করতে হবে। যখন ব্যাটারী সম্পূর্ণ চার্জড হয়ে যাবে তখন এ্যামিটারের কাঁটা 0—( শূন্য ) এ্যাম্পিয়ার নির্দেশ দেবে। আগেই বলা হয়েছে এই সার্কিট অবশ্য একটা ব্যাটারী এলিমিনেটর হিসাবেও ব্যবহার করা চলে যার আউটপুট ভোল্টেজ রয়েছে OV থেকে 24V পর্যন্ত।

রেক্টিফায়েড সাপ্লাই ( Rectified Supply ) রেগুলেট করা হয় T1 এর সাহায্যে এবং আউটপুট প্রয়োজন মত বদলে দেওয়া চলে 6·8K পোটেনসিওমিটারকে অ্যাডজাস্ট করে। একটা ভোল্টামিটারের সাহায্যেই সহজে এটা Calibration করা যায়। এই চার্জার কাম ব্যাটারী এলিমিনেটরের সার্কিট ডায়াগ্রামের ছবি ভাল করে দেখ। এ্যামিটার, রেক্টিফায়ার ডায়োড ও ভোল্টেজ ( সেকেণ্ডারী ) সার্কিট ডায়াগ্রামের যেখানে লেখা হয়েছে, সেখান থেকে ভাল করে দেখে নাও। এই সার্কিটটা বানাতে তোমার প্রায় একশ টাকা খরচ পড়বে।

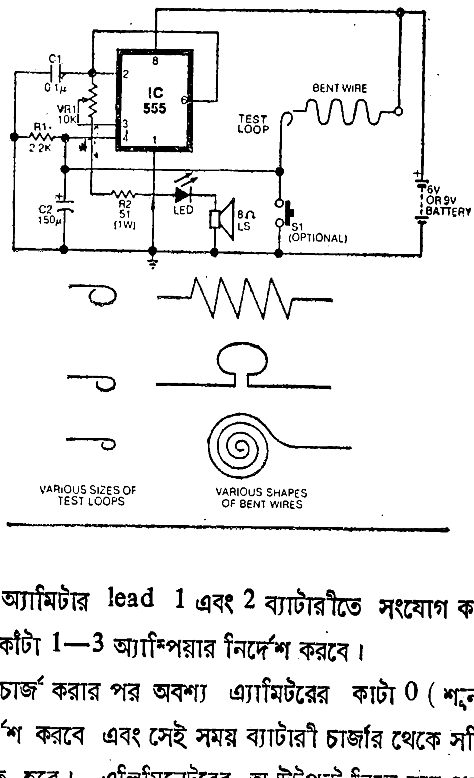


অ্যামিটার lead 1 এবং 2 ব্যাটারীতে সংযোগ করার পর কাঁটা 1—3 অ্যাম্পিয়ার নির্দেশ করবে।

চার্জ করার পর অবশ্য এ্যামিটরের কাটা 0 ( শূন্য ) নির্দেশ করবে এবং সেই সময় ব্যাটারী চার্জার থেকে সরিয়ে নিতে হবে। এলিমিনেটরের আউটপুট নিতে হবে পয়েণ্ট 3 এবং 4 থেকে (1 এবং 3 পজিটিভ, 2 এবং 4 নেগেটিভ) ; এলিমিনেটরের নেগেটিভ লাইন যাতে earth মনে করে ট্রান্সফরমারের আর্থের সঙ্গে ভুল করে যোগ করা না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে।

# সবচেয়ে হাল্কা মৌল

## অমরনাথ রায় ও বিবেক রায়

পৃথিবীতে যত মৌল আছে তার মধ্যে সবচেয়ে হাল্কা মৌল হলো হাইড্রোজেন। হাইড্রোজেন-এর চিহ্ন হলো H, আণবিক সংকেত হলো $H^2$ এবং পারমাণবিক গুরুত্ব হলো 1·008

এই গ্যাসটির আবিষ্কর্তা হলেন হেনরি ক্যাভেণ্ডিশ (1731—1810) নামে এক ইংরেজ বিজ্ঞানী। তিনি এই গ্যাসটির নাম রাখেন 'দাহ্য বায়ু', এরপর অ্যাণ্টোয়াইন লরেণ্ট ল্যাভয়সিয়ে (1743—1794) নামে এক ফরাসী রসায়নবিদ 'দাহ্য বায়ু'র নাম রাখেন 'জল উৎপাদক', কারণ এই মৌলটি বায়ুর অক্সিজেনের সংস্পর্শে জ্বলে জল উৎপন্ন করে।

হাইড্রোজেন গ্যাস প্রকৃতিতে নগণ্য পরিমাণে পাওয়া যায় কিন্তু যৌগ অবস্থায় এই মৌলটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। হাইড্রোজেন নামক মৌলটির প্রধান উৎস হলো জল। অ্যাসিড, ক্ষার এবং অনেক জৈব যৌগেই এই মৌলটি বর্তমান। কাজেই অ্যাসিড, ক্ষার এবং জল থেকে এই গ্যাসটিকে প্রস্তুত করা হয়। পরীক্ষাগারে জিঙ্কের ছিবড়া এবং লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় সাধারণ উষ্ণতায় এই গ্যাসটি প্রস্তুত করা হয়। স্বল্প-মাত্রায় হাইড্রোজেন প্রস্তুতির জন্যে পরীক্ষাগারে সাধারণত 'উলফ্ বোতল' ব্যবহার করা হয়। আর গ্যাসটিকে জলের নিম্নাপসারণ দ্বারা গ্যাসজারে সংগ্রহ করা হয়। প্রয়োজন মতো এবং নিয়মিত হাইড্রোজেন গ্যাস পেতে হলে 'কিপ্‌যন্ত্র' ব্যবহার করা হয়। যদি অতিবিশুদ্ধ হাইড্রোজেন গ্যাস প্রস্তুত করতে চাও তাহলে একটি U আকৃতির টিউবে বেরিয়াম হাইড্রকসাইডের পাতলা ও উষ্ণ জলীয় দ্রবণকে নিকেল তড়িৎদ্বার ব্যবহার করে তড়িৎ বিশ্লেষণ করতে হবে, সেক্ষেত্রে ক্যাথোডে হাইড্রোজেন গ্যাস পাওয়া যাবে। লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড বা লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে আয়রন, অ্যালুমিনিয়ম ও ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি ধাতুর বিক্রিয়াতেও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। আবার তড়িৎ রাসায়নিক শ্রেণীতে শীর্ষ স্থানাধিকারী ধাতুগুলি (যথা সোডিয়াম ও ক্যালসিয়াম) ঠাণ্ডা জলকে বিশ্লিষ্ট করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে। আবাব ক্ষার থেকেও হাইড্রোজেন প্রস্তুত করা যায়। উত্তপ্ত ও গাঢ় কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাশের দ্রবণের সঙ্গে জিংক, অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর চূর্ণ বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।

হাইড্রোজেন গ্যাসটি বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং স্বাদহীন পদার্থ। জলে এর দ্রাব্যতা খুবই কম। হাইড্রোজেনের একটি অণুতে দুটি পরমাণু থাকে। এই গ্যাসটি দাহ্য, কিন্তু অপরের দহনের সহায়ক নয়। বায়ু বা অক্সিজেন গ্যাসে পোড়ালে হাইড্রোজেন গ্যাস নীলাভ শিখায় জ্বলে এবং জল উৎপন্ন করে। এই কারণেই হাইড্রোজেনের অপর নাম 'জল উৎপাদক'।

বিচূর্ণ সালফারকে উত্তাপ প্রয়োগে গলিয়ে ঐ গলিত সালফারের মধ্যে হাইড্রোজেন গ্যাস পরিচালনা করলে তৈরি হয় 'হাইড্রোজেন-সালফাইড' গ্যাস। আবার 200 বায়ুমণ্ডলীয় চাপে, 550° সেলসিয়াস উষ্ণতায়, আয়রন চূর্ণ অনুঘটকের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেন গ্যাস নাইট্রোজেন গ্যাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'অ্যামোনিয়া' নামক গ্যাস উৎপন্ন করে। এ ভিন্ন তড়িৎ স্ফুলিঙ্গের সাহায্যে কার্বন ও হাইড্রোজেন গ্যাস সংযুক্ত হয়ে 'অ্যাসিটিলিন' নামক হাইড্রোকার্বন যৌগ উৎপন্ন করে। এ ভিন্ন, উত্তপ্ত সোডিয়াম, পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়াম ধাতুর উপর দিয়ে শুষ্ক হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবাহিত করলে যথাক্রমে সোডিয়াম হাইড্রাইড, পটাসিয়াম হাইড্রাইড ও ক্যালসিয়াম হাইড্রাইড যৌগ উৎপন্ন হয়। ক্যালসিয়াম হাইড্রাইডকে বলা হয় 'হাইড্রোলিথ'।

হাইড্রোজেন একটি উৎকৃষ্ট বিজারক পদার্থ। কালো ও উত্তপ্ত কিউপ্রিক অক্সাইডের উপর দিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস পরিচালনা করলে কিউপ্রিক অক্সাইড ধাতব কপাররূপে বিজারিত হয়। এ ভিন্ন, প্যালাডিয়াম, প্লাটিনাম, নিকেল, কোবাল্ট প্রভৃতি ধাতু উত্তপ্ত অবস্থায়, এমন কি সাধারণ উষ্ণতায় হাইড্রোজেন গ্যাসকে শোষণ করতে পারে। ধাতুর এই রকম গ্যাস শোষণ করার ক্ষমতাকে বলা হয় 'অন্তর্ধৃতি' এবং শোষিত হাইড্রোজেনকে বলা হয় 'অন্তর্ধৃত হাইড্রোজেন'। হাইড্রোজেন যখন তার কোন যৌগ থেকে সদ্যমুক্ত হয়, তখন সেই জন্ম মুহূর্তের হাইড্রোজেনকে বলা হয় 'জায়মান হাইড্রোজেন'। সাধারণ হাইড্রোজেনের চেয়ে জায়মান হাইড্রোজেন অনেক বেশি শক্তিশালী বিজারক পদার্থ। সাধারণ উষ্ণতায় হাইড্রোজেন—অর্থো ও প্যারা, এই দু'রকম হাইড্রোজেনের 3 : 1 অনুপাতের সাম্যাবস্থার মিশ্রণ। সবচেয়ে হাল্কা গ্যাস বলে হাইড্রোজেন বেলুনে ভরা হয়। এছাড়া অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসকে মিশিয়ে 'অক্সি-হাইড্রোজেন' শিখা উৎপন্ন করা হয়। এই শিখার উষ্ণতা 2500°C পর্যন্ত হয়। ঝালাই-এর কাজে এই শিখা ব্যবহৃত হয়।

# আন্দামানের ম্যানগ্রোভ

তপন আদক

সবুজ দ্বীপ আন্দামান। দ্বীপমালার উপর দিয়ে আকাশ পথে যেতে যেতে নিচের দিকে তাকালে মনে হবে, সবুজ সবুজ কয়েকটা ঢিবি যেন সাগরের নীল জলে ভাসছে। দ্বীপপুঞ্জের সবুজ বনানীর শুরু একেবারেই উপকূলের গা ঘেঁসে। জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করার সময়ে ডেকে দাঁড়ালে চোখে পড়বে অগভীর জলের উপর গা ঘেসা-ঘেসি করে দাঁড়িয়ে আছে চিরহরিত বন। আন্দামানের প্রায় সব উপকূলবর্তী অঞ্চলে কিংবা যে সমস্ত সমুদ্রখাঁড়ি দ্বীপের ভিতরে বেশ কিছুটা ঢুকে গেছে সে সব খাঁড়ির দু পাশেই দেখা যাবে নোনা জলের উপর দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য গাছ। এ সব গাছগুলোর নাম ম্যানগ্রোভ।

গাছেদের বংশ বিস্তার হয় বীজ, শিকড়, পাতা কিংবা ডাল থেকে। ফলফুলের গাছের কৃত্রিমভাবেও বংশ বিস্তার হয়। কলম ( কাটিং ) এর অভিনব কৌশলে তো আজকাল একই গাছে আম আর আতা ফলতে পারে। সুকুমার রায়ের ভাষায় এ গাছের নাম 'আমতা' রাখলে ক্ষতি কি? কিন্তু ম্যানগ্রোভ গাছের বংশবৃদ্ধি রীতির মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে। গাছে লম্বা লম্বা লাঠির মতো ফল ঝুলতে থাকে। বীজের লুপ্ত অবস্থা বলে কিছু নেই। ফলটি বা বীজটি গাছেই অঙ্কুরিত হয়ে যায়। ফলের ডগার দিকটি শক্ত ও সুচালো হয়। সুপক্ক হয়ে গেলে টুপ করে ফলটি পড়ে যায় লম্বভাবে। নিচে কর্দমাক্ত মাটি থাকায় ফলের সুঁচালো প্রান্তটি কাদায় গেঁথে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার থেকে নতুন গাছ জন্ম নেয়। লম্বা লাঠির মতো ফলটি পরিণত হয় গাছে। দোদুল্যমান ফলগুলি যদি জোয়ারের সময় জলে পড়ে তাহলে ফলগুলি ভাসতে ভাসতে দূরে চলে যায়। সমুদ্রের নোনা জলে ফলটি বহুদিন পর্যন্ত না পচে ভেসে থাকতে পারে। ভাসতে ভাসতে ফলের নিমজ্জমান প্রান্তটি যখন উপকূলের কাছাকাছি কাদামাটির স্পর্শ পায় তখন সে জায়গায় অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সেটি শিকড় বিস্তার করতে থাকে। এভাবে স্থান থেকে স্থানান্তরে ম্যানগ্রোভের বংশ বিস্তার হয়ে থাকে। গাছ একটু বড় হলে গাছের কাণ্ড থেকে অসংখ্য শিকড় বটের ঝুরির মতো নিচের দিকে নেমে এসে কাদামাটিতে প্রোথিত হয়। এ ধরনের শিকড়গুলো ধনুকের মতো বাঁকা বাঁকা হয়। এ শিকড়গুলি জোয়ারের স্রোত এবং ঝড় ঝঞ্ঝা থেকে গাছগুলোকে রক্ষা করে। কারণ শিকড়গুলো গাছকে মাটির সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করে রাখে। লাল ম্যানগ্রোভ বেশ গভীর জলেও জন্মাতে

পারে। অসংখ্য শিকড় থাকার জন্যে উপকূলের কাদা-মাটিকে যেমন ক্ষয়ীভবন থেকে রক্ষা করে তেমনি উপকূলের সীমা ক্রমবর্ধমান হয়। ম্যানগ্রোভের ভাসমান ফল অগভীর সমুদ্রে নতুন করে জঙ্গলের সৃষ্টি করে, ক্রমে একটা নতুন দ্বীপ জেগে ওঠে। জলের মধ্যে এ ধরনের জঙ্গল অঞ্চলে সমুদ্র-শামুক, কাঁকড়া এবং অন্যান্য সামুদ্রিক জীবের উৎকৃষ্ট বাসস্থান।

ম্যানগ্রোভের শিকড়গুলো কাদামাটির ভিতরে থাকায় কিংবা শিকড় জলে ডুবে থাকায় অথবা অনেক শিকড় অক্সিজেনহীন জায়গায় প্রবেশ করায় অনেক সময়ে এদের বাড়তি অক্সিজেনের দরকার হয়। তখন এক অদ্ভুত উপায়ে এ গাছ বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণের ব্যবস্থা করে। গাছের আনুভূমিক শিকড় থেকে বেশ কিছু ঊর্ধ্বমুখী শিকড় বেরোয়। ভাটার সময় ঐ শিকড়গুলি বাতাস থেকে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন টেনে নেয়। মাটির উপরে থাকায় এরা সহজেই বাতাস থেকে অক্সিজেন টেনে নিতে পারে। এরকমভাবে অক্সিজেন টেনে নিয়ে ম্যানগ্রোভ তার অন্যান্য মূল প্রবাহে অক্সিজেন প্রেরণ করে শ্বাসকার্য চালায়।

ম্যানগ্রোভের অনেকগুলো জাত আছে। তার মধ্যে আন্দামানে দেখা যায়—দুধে ম্যানগ্রোভ, কমলা ম্যানগ্রোভ, লাল ম্যানগ্রোভ এবং সাদা ম্যানগ্রোভ। অনেক জায়গায় কালো ম্যানগ্রোভও দেখা যায়। দুধে ম্যানগ্রোভের গাছগুলো হয় ছোট ছোট, এ গাছের পাতা বা ডাল ভাঙলে দুধের মতো এক ধরনের রস নির্গত হয়। এর পাতা হয় দুই থেকে চার ইঞ্চি লম্বা। গাছের ডালগুলি হয় ঊর্ধ্বমুখী। এপ্রিল-মে মাসে গাছের পাতা ঝরে যায়, ঝরে যাবার সময় পাতা লাল অথবা পীতাভ রঙ ধরে। পুনরায় যখন গাছগুলো ছোট ছোট পাতায় ভরে যায় তখন গাছগুলোকে অপূর্ব দেখায়। এ গাছের দুধের মতো রস মানুষের ত্বকে লাগলে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। কোনক্রমে রস চোখে পড়লে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়। এজন্যে এ গাছের অন্য নাম অন্ধ গাছ। সমুদ্রের খাড়িতে এ গাছগুলো জন্মানোর উপযুক্ত স্থান।

কমলা ম্যানগ্রোভ আন্দামানের প্রায় সর্বত্র দেখা যায়। সমুদ্রের খাড়ি বা উপকূলে বেশ বড় বড় গাছ হয়। দক্ষিণ আন্দামানের বিনালিটন, মধ্য আন্দামানের বেটাপুর ও ইরেটায় এ ধরনের গাছ প্রচুর দেখা যায়। যে স্থানে গাছ-প্রচুর দেখা যায়, সে স্থানে গাছগুলো জন্মানোর কয়েক বছরের মধ্যে বেশ কিছুটা জায়গা বনভূমিতে পর্যবসিত হয়। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে গাছে ছোট ছোট ফুল হয়। গাছের কাঠ বেশ শক্ত, কিন্তু সৌখিন আসবাবের কাজে এর কাঠ ব্যবহার হয় না। এর কাঠ স্থানীয় লোকেরা জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে। স্থানীয় লোকেরা এ কাঠকে বলে খাঁড়ি লকড়ি।

লাল ম্যানগ্রোভও আন্দামানের সব জায়গায় পাওয়া যায়। নভেম্বর থেকে জানুয়ারীর মধ্যে গাছে ক্ষুদ্রাকার ফুল ফোটে এবং ফেব্রুয়ারী থেকে জুন মাস পর্যন্ত গাছে ফল ধরে। বেশ গভীর জলেও এ গাছ জন্মাতে পারে। এ গাছের কাঠগুলি হয় গোলাপী রঙের। এ ছাড়া আন্দামানে আছে সাদা ম্যানগ্রোভ। এ গাছের আকার খুব বড় হয় না। সারা বছরই বনে সবুজের সমারোহ। বর্ষাকালে এ গাছে ফুল ধরে। এ গাছের নাসিকামূল দেখা যায়।

ম্যানগ্রোভের বাণিজ্যিক মূল্যও কম নয়। গ্রীষ্ম-মণ্ডলীয় দেশে ম্যানগ্রোভের কাঠ দিয়ে খুঁটি, রেলের পাটাতন কাঠকয়লা প্রভৃতি তৈরি হয়। তাছাড়া সবচেয়ে মূল্যবান যে বস্তুটি ম্যানগ্রোভ থেকে পাওয়া যায় তার নাম ট্যানিন। ট্যানিন ম্যানগ্রোভ গাছের শক্ত ছাল থেকে পাওয়া যায়। 20 থেকে 43% পর্যন্ত ট্যানিন এর ছাল থেকে তরলাকার অথবা গুঁড়ো আকারে পাওয়া যায়। মোটা চামড়া ট্যান করতে ট্যানিন ব্যবহার হয়। আমেরিকায় ট্যানিনের চাহিদা খুব বেশি, তাই পূর্ব আফ্রিকা ইস্ট ইণ্ডিজ থেকে জাহাজ বোঝাই ট্যানিন যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী হয়।

ম্যানগ্রোভের পাতা হয় প্রায় আয়তাকার, প্রান্তদ্বয় একটু সুঁচালো। উপরিভাগ এত মসৃণ মনে হয় যেন কারা বার্নিশ করে রেখেছে। দক্ষিণ আন্দামানের রাইটমেয়োর খাঁড়িতে যদি কেউ ডোঙ্গিতে করে বেড়াতে যান তাহলে দেখতে পাবেন দুপাশে শুধু ম্যানগ্রোভ আর ম্যানগ্রোভ; মাঝে মধ্যে দু একটা মেছো কুমিরের সাথেও সাক্ষাৎ হতে পারে।

---

স্টেট সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী, পোর্টব্লেয়ার আন্দামান।

# কয়লা যেন কামধেনু

আব্দুল হক খন্দকার

কামধেনু কি, সে কথা তোমরা হয়তো জান। পুরাকালে বশিষ্ঠ নামে এক ঋষি ছিলেন। কামধেনু হলো তাঁরই এক আজব কিসিমের গাই! আজব এ জন্য যে,—দোহন কালে এর কাছ থেকে যা চাওয়া যেত তাই পাওয়া যেত হাতের কাছে! কিন্তু কয়লার সাথে তার কী এমন সম্পর্ক রয়েছে,—যার জন্য তাকে তুলনা করা যেতে পারে ঐ কামধেনুর সঙ্গে? কারণ হলো,—কয়লাও এমনই এক বিচিত্র বস্তু—যা থেকে তোমরা ইচ্ছে করলে কত রকমের জিনিস যে তৈরি করতে পার—তা যেমন বলে শেষ করা যাবে না—তেমনি কয়লার মত সাধারণ এক বস্তু থেকে এত সব মূল্যবান সামগ্রী যে পাওয়া যেতে পারে, সে সংবাদে তোমরা বিস্ময় প্রকাশ না করেও থাকতে পারবে না। ভাবতে পার, যে কয়লাকে আমরা তেমন মূল্যবান বস্তু হিসাবে গণ্য করি না,—তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করি তার কালিমার জন্য—আর সে কালিমা এমনই অক্ষয় যে হাজারো ধোয়া-মোছাতেও মুছে যায় না তার মালিন্য—সেই কালো কয়লা থেকেই পাওয়া যায় এমন সব বাহারে রঙ—যে সব রঙের বাহার আমাদের প্রকৃতিকে করে তুলেছে এমন রূপময়, এমন মনোরম! সকাল-সন্ধ্যার আকাশে প্রজাপতির রঙিন পাখায়, গাছের পাতায়, ফুলে-ফলে, রঙ-ধনুতে যে সকল বর্ণের বিকাশ ঘটে সে সব তো আছেই—এমন কি প্রকৃতির বুকে যে রঙের লেশ মাত্র নেই—সেই রঙটি পর্যন্ত পাওয়া যায় ঐ কুচকুচে কালো কয়লা থেকে? আর শুধু কি রঙ? কালো কয়লা থেকে—আরো কালো—অতি দুর্গন্ধযুক্ত যে আলকাতরা পাওয়া যায়—তা থেকেই তৈরি হয় বিভিন্ন ফুলের সুমিষ্ট সুগন্ধী—এমনকি এমন সব মন মাতানো সুরভি—যাদের কণামাত্রও তৈরি হয় না প্রকৃতির কারখানায়? আবার এই তিক্ত, বিষাক্ত আলকাতরা,—তথা কয়লা থেকেই তৈরি হয় এমনও মিষ্ট দ্রব্য,—স্যাকারিন, যার মিষ্টত্ব চিনির চেয়েও 400/500 গুণ বেশি?

স্যাকারিন তোমাদের কাছে পরিচিত, তাই ওটির কথাই আগে বললাম। মিষ্টত্বে স্যাকারিনকেও ছাড়িয়ে যায় এমনও দ্রব্য আছে—নাম এন প্রপোক্সি ( N Propoxy ),—যার মিষ্টত্ব চিনির চেয়েও চার হাজার গুণ বেশি এবং আশ্চর্য সেটিও তৈরি হয় আলকাতরা থেকেই পাওয়া এক পদার্থ থেকে। আরও আশ্চর্যের কথা—আমাদের প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই—যেমন, পরনের কাপড়-চোপড়, খাদ্য উৎপাদনের জন্য জমির সার, প্রতিরক্ষার জন্য বিস্ফোরক দ্রব্য, রোগ নিরাময়ের জন্য ঔষধপত্র কাঠ ও ধাতুর বিকল্প প্লাস্টিক্ প্রভৃতি বহু প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎস হলো এই কালো কয়লা।

এরপর তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করছে কয়লা থেকে কি কি দ্রব্য পাওয়া যায়—আর কেনই বা তারা মূল্যবান। কিন্তু বিপদ হলো—একটি মাত্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাদের সব কটির কথা বলা সম্ভব নয়,—তাই কয়েকটির কথাই এখানে বলবো—যা থেকে তোমরা অনেকটাই আঁচ করতে পারবে—কয়লাকে আমরা যতই সাধারণ, সামান্য জিনিস বলে মনে করি না কেন,—তার কালো, কুৎসিত চেহারার জন্য যতই তাকে অনাদর, অবজ্ঞা করি না কেন,—আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তার প্রয়োজন,—তার অবদান সত্যই অপরিসীম।

কয়লার সাধারণ ব্যবহারের কথা সবারই মোটামুটি ভাবে জানা। যেমন,—রান্নার কাজে চুলোয় কয়লা জ্বালানো হয়। কয়লা জ্বালিয়ে জলকে বাষ্পীভূত করে—সেই বাষ্পীয়

শক্তিকে কাজে লাগিয়ে রেলগাড়ি, জাহাজ, কলকারখানার ইঞ্জিন প্রভৃতি চালানো ছাড়াও ডায়নামোর সাহায্যে তৈরি করা হয় বিদ্যুৎ—যে বিদ্যুৎ না হলে আমাদের আধুনিক জীবনযাত্রা অনেকটাই অচল। এ সব কাজে কয়লাকে যখন পোড়ানো হয়—তখন প্রাচীন কালের গাছপালা থেকে যে কয়লার উৎপত্তি—সেই গাছপালার মধ্যে যে সৌরশক্তি সঞ্চিত ছিল রাসায়নিক শক্তি হিসাবে ( সালোক সংশ্লেষ বা Photo-synthesis-এর সূত্রে )-তাই প্রকাশ পায় তাপ এবং আলোর বিকাশের মাধ্যমে। কিন্তু এভাবে কয়লা পোড়ালে - কয়লা থেকে অনেক জিনিসই আমরা পাই না,—নষ্ট হয় এবং সত্যি কথা বলতে কি এভাবে কয়লা পোড়ানো এক বিরাট ক্ষতি, এক বিরাট অপচয়। বস্তুতঃ বাতাসের সংস্পর্শে কয়লাকে না পুড়িয়ে –তাকে যদি বাতাসের সংস্পর্শ বাঁচিয়ে, বেশ উচ্চ তাপে ( 90 )—1300 ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড) উত্তপ্ত করে পাতিত ( distil ) করা যায়—যাকে বলে অন্তর্ধূম পাতন ( destric-tive distillation )—তবে কয়লা থেকে যত জিনিস পাওয়া যাবে—তাদের মূল্য দাঁড়াবে—সাধারণ ভাবে কয়লা পোড়ানোর চেয়ে বহু গুণে বেশি। আগেকার দিনে এ খবরটা মানুষের মোটেই জানা ছিল না। তাই কয়লাকে কোনো কোনো কাজে ব্যবহারের জন্য—যেমন, খনি থেকে ধাতু নিষ্কাশনের কাজে কোক ( coke ) তৈরির জন্য, কয়লাকে খোলামেলা অবস্থায় পোড়ানো হতো। কিন্তু আজকাল তা করা হয় না। এক ধরনের রিটর্টে ( retort ) বাতাসের অনুপস্থিতিতে উত্তপ্ত করে যেমন কোক উপজাত দ্রব্য ( by product ) পাওয়া যায়—তেমনি তার সাথে আরো এমন কিছু দ্রব্য পাওয়া যায়, শিল্পক্ষেত্রে কাঁচা মাল হিসাবে যাদের বেশ চাহিদা রয়েছে। তাই আগের দিনে কোক তৈরি কিংবা রান্নার কাজে কয়লাকে খোলা অবস্থায় পুড়িয়ে কত যে মূল্যবান দ্রব্যের অপচয় ঘটেছে—সে কথা ভেবে আজ বিজ্ঞানীদের আর আপশোসের সীমা নেই।

যা হোক্, কয়লাকে অন্তর্ধূম পাতন করলে তা থেকে প্রধানতঃ পাওয়া যায় 4টি পদার্থ। এগুলি হলো,—কোল গ্যাস ( coal gass ), আলকাতরা (coal tar), অ্যামোনিয়া তরল ( liquor ammonia ) এবং কোক। এক টন কয়লা থেকে 10 হাজার ঘনফুটের মত কোল গ্যাস, 120 পাউণ্ডের মত আলকাতরা এবং 3/4 টন কোক পাওয়া যায়। কোল গ্যাস জ্বালানী এবং গ্যাসবাতির জন্য ব্যবহৃত হয়। কোক ব্যবহৃত হয় খনি থেকে ধাতু নিষ্কাশনের কাজে—যেমন লোহার আকরিক ( ore )—'হেমাটাইট' থেকে কোকের সাহায্যে তৈরি করা হয় লোহা এবং ইস্পাত। অ্যামোনিয়া-তরল থেকে পাওয়া যায় অ্যামোনিয়া যা হিমায়ন ( refri-geration )-এর কাজে, জমির সার এবং বিস্ফোরক দ্রব্য তৈরির জন্য ব্যবহৃত হয়। আর যে আলকাতরা পাওয়া যায়—প্রকৃতপক্ষে, সেটিই হলো এক অসাধারণ পদার্থ—মূল্যবান রত্নরাজির এক অপূর্ব আধার! এ থেকেই আমরা পাই হাজারো রকমের দরকারী দ্রব্য। কিন্তু মজার কথা কি জান? এককালে এই প্রয়োজনীয় জিনিসটি ফেলনা দ্রব্য হিসাবে ফেলে দিয়ে আসা হতো সমুদ্রের জলে। কেননা, আলকাতরার মধ্যে যে এত সব সম্পদ নিহিত রয়েছে—সে কথা তখনকার লোকের যেমন জানা ছিল না—তেমনি এক সমুদ্র ছাড়া—গ্যাস তৈরির কারখানার ধারে কাছের মাঠে ময়দানে বা নদীতে সেটিকে ফেলার উপায় ছিল না। আলকাতরা যেমন দুর্গন্ধযুক্ত তেমনি বিষাক্ত। পোড়ো জমিতে ফেললেও পাশাপাশি ক্ষেতের ফসলের ক্ষতি করতো— চারি-দিকে গন্ধ ছড়াতো—পরিবেশকে করতো কলুষিত। নদীতে ফেলারও উপায় ছিল না,—মাছের বংশ একেবারে নির্বংশ করতো বলে। তাই সমুদ্রই ছিল আলকাতরার একমাত্র "ডাস্টবিন"। গ্যাসের কারখানাগুলিকে তাই পয়সা খরচ করে এই অমূল্য পদার্থটিকে ফেলে দিয়ে আসতে হতো সুদূরের সমুদ্রে।

কিন্তু হঠাৎ করেই একদিন পটের পরিবর্তন ঘটলো। যে আলকাতরা ছিল গ্যাস কোমপানীগুলির মাথাব্যথা—গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে ফেলে দিয়ে আসতে হতো সমুদ্রে—তাই সমাদরে স্থান পেতে লাগলো বিভিন্ন কারখানায়। বিজ্ঞানীরা একে একে উদ্ধার করতে লাগলো—বিচিত্র, নানা ধরনের সব দরকারী জিনিস ঐ ফেলনা, অকেজো আলকাতরা থেকে!

বলতে পার, এই বিস্ময়কর ব্যাপারটি ঘটলো কেন? কারণটা খুবই মজার। 17 বছরের এক তরুণ বিজ্ঞানীর আকস্মিক এক আবিষ্কারের ফলে। তরুণটির নাম উইলিয়াম হেনরী পারকিন। রসায়নের প্রতি তাঁর ছিল ভীষণ ঝোঁক—নতুন কিছু আবিষ্কারের নেশায় বাল্য বয়স থেকেই চলছিল তাঁর গবেষণা, সাধনা। বাড়িতেই এক ছোটখাটো ল্যাবরেটরি বানিয়েছেন। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে চলে টুকিটাকি পরীক্ষার কাজ।

সিনকোনা গাছ থেকে তৈরি কুইনিনের দাম তখন বেশ চড়া। ঝোঁকের মাথায় তাই একদিন তিনি ঠিক করলেন কৃত্রিম উপায়ে কুইনিন তৈরি করবেন। কিন্তু রসায়নে তখন তাঁর যা জ্ঞান তাতে করে কুইনিন তৈরি করা তাঁর পক্ষে যেমন ছিল অসম্ভব —তেমনি কাজটি ছিল এমনি কঠিন যে তখনকার কোনো পরিপক্ক বিজ্ঞানীর পক্ষেও তা পেরে ওঠা সম্ভবপর ছিল না। তাই এটি নেহাত পাগলামী ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। কিন্তু ঐ যে বলেছি,—তাঁর ছিল আবিষ্কারের নেশা, উন্মত্ততা—সেই সঙ্গে তরুণ বয়সের বেপরোয়া মনোভাব—উৎসাহ আর উদ্দীপনা। সম্বল তাঁর এটুকুই—আর তাই দিয়ে তিনি চেয়েছিলেন বাজিমাত করতে। বাজিমাত তিনি করলেন সত্যি—তবে কুইনিন তৈরি করে নয়। পরীক্ষা চালাতে গিয়ে তিনি আলকাতরারই এক

দ্রব্য থেকে আকস্মিক ভাবে আবিষ্কার করলেন সর্ব প্রথম কৃত্রিম এক বেগুনী বর্ণের রঙ—যার নাম "মভ" (Mauve)। পার্কিনের এই আবিষ্কার যেমন রসায়নের এক নতুন দিগন্তের দ্বার খুলে দিল—তেমনি শিল্পক্ষেত্রেও তা আনলো এক দারুণ বিপ্লব। বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আলকাতরার প্রতি বিশেষ ভাবেই আকৃষ্ট হলো—আর অল্প দিনের মধ্যেই কত যে রঙ আবিষ্কৃত হলো আলকাতরা জাত দ্রব্যাদি থেকে তার ইয়ত্তা নেই। কৃত্রিম রঙে বাজার ছেয়ে গেল—উধাও হলো বাজার থেকে যত সব প্রাকৃতিক ধরনের রঙ।

শুধু রঙ নয়, আজকাল আলকাতরা থেকে তৈরি হয় এত সব জিনিস—যাদের সম্পর্কে সামান্যতম বর্ণনা দিতে গেলে একটি প্রবন্ধে কখনই কুলাবে না—লিখতে হবে এক বিরাট বই। তাই নিচে, মোটামুটি ভাবে একটি চার্ট তৈরি করে দিলাম। এতে কয়লা এবং আলকাতরা থেকে পাওয়া দ্রব্যাদির কিছুটা পরিচয় যেমন তোমরা পাবে—তেমনি দেখতে পাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় অধিকাংশ জিনিসই আমরা পাই আলকাতরা থেকে। যেমন মোটর গাড়ি ও উড়োজাহাজের জ্বালানীতে ব্যবহারের জন্য "বেনজল" (benzol)। বস্তুতঃ রেকর্ড ভঙ্গকারী মোটর গাড়ির জন্য বেনজল অপরিহার্য। তাছাড়া ড্রাইক্লিনিং-এর কাজে এবং বিভিন্ন রঞ্জক (dye) দ্রব্য তৈরির কাঁচামাল হিসাবে বেনজল ব্যবহৃত হয়। আলকাতরা থেকে যে "বেনজিন" (benzene) পাওয়া যায়—দ্রাবক এবং ড্রাই ক্লিনিং-এর কাজে ব্যবহার ছাড়াও কৃত্রিম রাবার, প্লাস্টিক নাইলন, কীটনাশক দ্রব্য, কার্বলিক অ্যাসিড প্রভৃতি তৈরির জন্য এটি একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাঁচামাল। বেনজল, বেনজিন ছাড়াও আলকাতরা থেকে যে সকল দ্রব্য পাওয়া যায়—যেমন, টলুইন, জাইলিন, কার্বলিক অ্যাসিড, পিরিডিন, ন্যাপথ্যালিন, অ্যানথ্রাসিন, ফিনানথিন প্রভৃতি—তাদের কোনো কোনোটি থেকে তৈরি হয় নানা জাতের রঞ্জক দ্রব্য, পেইন্ট, বার্নিশ, প্লাস্টিক (ডেকরন, নাইলন, বেকেটলাই প্রভৃতি); বিস্ফোরক দ্রব্য (টি.এন.টি পিকরিক অ্যাসিড, 'অ্যামাটল প্রভৃতি), স্যাকারিন, ঔষধ পত্র (বেদনা ও চেতনা নাশক, বীজবারক, ভিটামিন, সালফাড্রাগস্ প্রভৃতি), ফটোগ্রাফির কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যাবতীয় সুরভি উৎপন্নের বিভিন্ন উপাদান—এমনি আরো কত কি! তাছাড়া কয়লা থেকে গ্যাস তৈরির সময় রিটর্টের ভেতরের দিকে যে গ্রাফাইট জমে তাও কম প্রয়োজনীয় নয়—এমন কি গ্যাস কারখানার চিমনীতে যে কালি জমে তাও ফেলনা নয়।

সেই কয়লা কতই না বিচিত্র বর্ণের—কত প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর এক উৎকৃষ্ট উৎস। কালো কয়লা তাই এমন এক বিরাট পরিবারের মধ্যমণি হিসাবে বিরাজ করছে—যার প্রত্যেকটি সদস্য কোনো না কোনো দিকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করছে—মানব সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে তার অগ্রগতির পথে!

রাজার বাগ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

॥ সংসদের অভিধান গ্রন্থাবলী নির্ভরযোগ্য ॥

- সংসদ সমার্থশব্দকোষ [ ৪০·০০ ]
- সংসদ বাঙ্গালা অভিধান [ ৪০·০০ ]
- বাঙ্গালা ভাষার অভিধান
  দু'খণ্ডে প্রকাশিত [ প্রতিখণ্ড ৮০·০০ ]
- **Samsad English Bengali Dictionary [ 47·50 ]**
- **Samsad Bengali English Dictionary [ 42·50 ]**
- **Samsad Students Eng. Beng. Dictionary [ যন্ত্রস্থ ]**
- **Samsad Common Words Dictionary [ 12·50 ]**

সাহিত্য সংসদ ॥ ৩২ এ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯ ফোন ৩৫/৭৬৬৯

বিনা টিকিটের যাত্রী
অপরাধী
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে

খুদে বৈজ্ঞানিক
দিলীপ দাস
ফুটন্ত জল থেকে বাষ্প বেরিয়ে কেটলীর ঢাকনা ফেলে দিচ্ছে— বৈজ্ঞানিক জেমস্ ওয়াট্ এটি লক্ষ্য করেছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন এর সুদূর প্রসারী ক্ষমতা। পরে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে আবিষ্কৃত হল বাষ্পীয় ইঞ্জিন বা স্টীম ইঞ্জিন। তোমরাও এটা পরীক্ষা করে দেখতে পারো।
একটা ইঞ্জিন বিরাট একটা গাড়িকে টেনে নিয়ে চলে স্রেফ এই বাষ্পীয় শক্তির জোরে। ভাবতে পারিস?
বাষ্প বা স্টীম দিয়ে ইঞ্জিন চালানো হয় বলে এর নাম স্টীম ইঞ্জিন।
পিসিমা এখনও ঘুমুচ্ছে!
রান্নাঘর ফাঁকা! এখন দরকার একটু জলের।
আরে, খুদেকে তো আগে কখনও এরকম হোম ওয়ার্ক করতে দেখিনি! ব্যাপার কি?
খুদে· খুদে-শোন!
দমাদম্

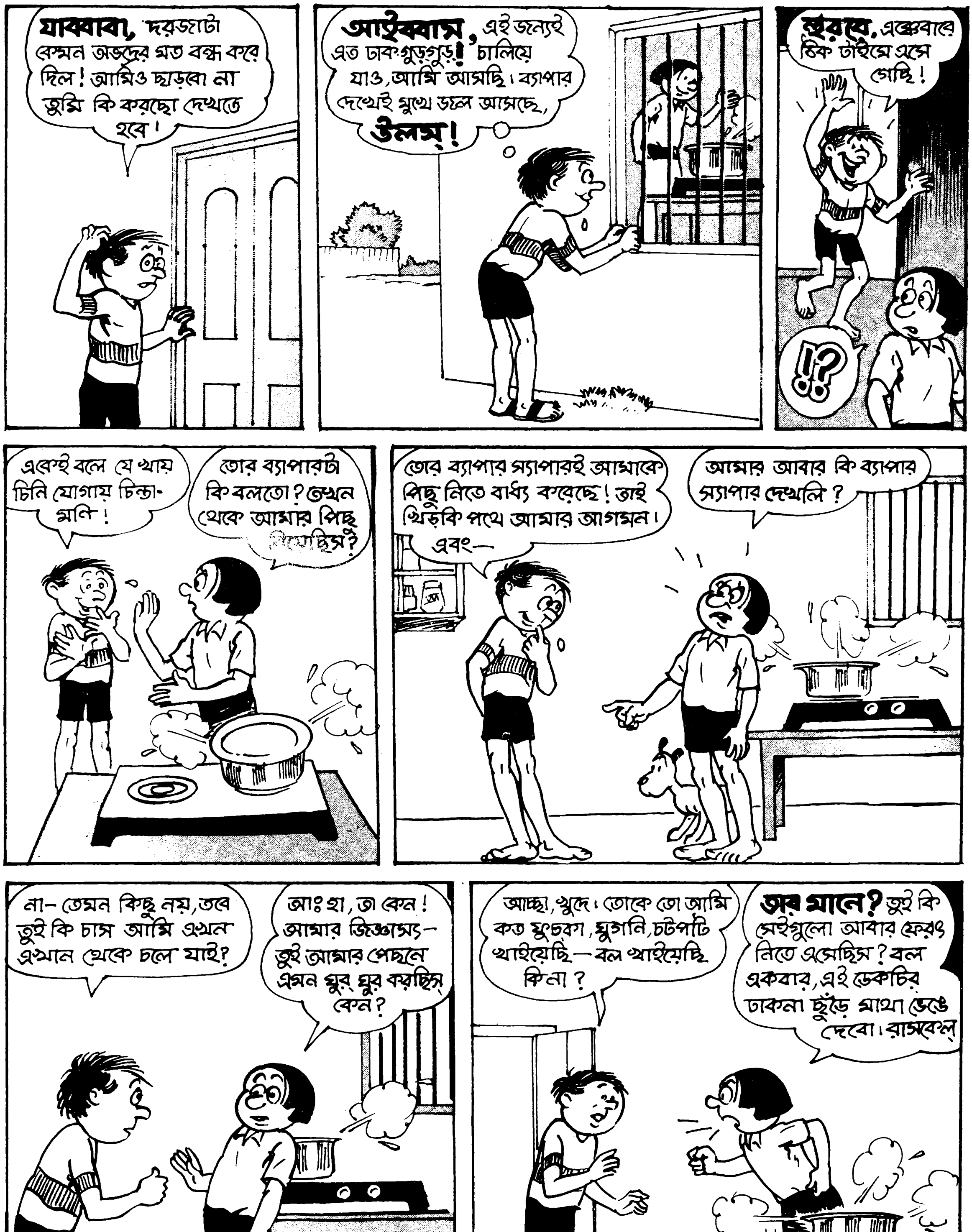
যাব্বাবা, দরজাটা কেমন অভদ্রের মত বন্ধ করে দিল! আমিও ছাড়বো না তুমি কি করছো দেখতে হবে।
আইব্বাস, এই জন্যেই এত ঢাকগুড়গুড়! চালিয়ে যাও, আমি আসছি। ব্যাপার দেখেই মুখে জল আসছে, উলস্!
হুররে, এক্কেবারে ঠিক টাইমে এসে গেছি!
!?
একেই বলে যে খায় চিনি যোগায় চিন্তামণি!
তোর ব্যাপারটা কি বলতো? তখন থেকে আমার পিছু নিয়েছিস?
তোর ব্যাপার স্যাপারই আমাকে পিছু নিতে বাধ্য করেছে! তাই খিড়কি পথে আমার আগমন।
এবং—
আমার আবার কি ব্যাপার স্যাপার দেখলি?
না— তেমন কিছু নয়, তবে তুই কি চাস আমি এখন এখান থেকে চলে যাই?
আঃ হা, তা কেন! আমার জিজ্ঞাস্য— তুই আমার পেছনে এমন ঘুর ঘুর করছিস কেন?
আচ্ছা, খুদে। তোকে তো আমি কত ফুচকা, ঘুগনি, চটপটি খাইয়েছি — বল খাইয়েছি কিনা?
তার মানে? তুই কি সেইগুলো আবার ফেরৎ নিতে এসেছিস? বল একবার, এই ডেকচির ঢাকনা ছুঁড়ে মাথা ভেঙে দেবো। রাসকেল্

যাব্বাবা, দরজাটা কেমন অভদ্রের মত বন্ধ করে দিল! আমিও ছাড়বো না তুমি কি করছো দেখতে হবে।
আইব্বাস, এই জন্যেই এত ঢাক-গুড়গুড়! চালিয়ে যাও, আমি আসছি। ব্যাপার দেখেই মুখে জল আসছে, উলস্!
হুররে, একেবারে ঠিক টাইমে এসে গেছি!
!?
একেই বলে যে খায় চিনি যোগায় চিন্তামণি!
তোর ব্যাপারটা কি বলতো? তখন থেকে আমার পিছু নিয়েছিস?
তোর ব্যাপার স্যাপারই আমাকে পিছু নিতে বাধ্য করেছে! তাই খিড়কি পথে আমার আগমন। এবং—
আমার আবার কি ব্যাপার স্যাপার দেখলি?
না— তেমন কিছু নয়, তবে তুই কি চাস আমি এখন এখান থেকে চলে যাই?
আঃ হা, তা কেন! আমার জিজ্ঞাস্য— তুই আমার পেছনে এমন ঘুর ঘুর করছিস্ কেন?
আচ্ছা, খুদে। তোকে তো আমি কত ফুচকা, ঘুগনি, চটপটি খাইয়েছি— বল খাইয়েছি কিনা?
তার মানে? তুই কি সেইগুলো আবার ফেরৎ নিতে এসেছিস? বল একবার, এই ডেকচির ঢাকনা ছুঁড়ে মাথা ভেঙে দেবো। রাসকেল্

নান্‌ না, ওটা ছোঁড়া-ছুঁড়ির কোন দরকার নেই। খালি ওতে যা হচ্ছে, তারই সামান্য কিছু আমার প্রার্থনা। আর এই জন্যেই তো—
তাই বল! সামান্য কেন? তোকে পুরোটাই দেবো, খেতে পারবি তো?
আরে, এ কি!
এই তো আমার সোনামণি! তা ওটা মাটন্‌ না চিকেন হচ্ছে?
ওটা হচ্ছে বাষ্পীয় শক্তির পরীক্ষা— স্টীম্‌-ওয়র্কস্‌!
স্টীম্‌!
ধাপ্‌!
হ্যাঁ গর্দভ স্টীম! যে শক্তিতে বড় বড় রেলগাড়ি জাহাজ স্টীমার ইত্যাদি চলে সেই বাষ্পীয় শক্তির পরীক্ষা এই ডেকচিতে ক'রে দেখছি।
ওঃ—কোন খাবারে জিনিস নয় শুধুই টগবগানী! আমি ভাবলুম—
এই সেই বাষ্পীয় শক্তি—জেমস্‌ ওয়াট যা আবিষ্কার করেছিলেন। এই বাষ্পের সাহায্যেই জর্জ স্টিফেনসন্‌ আবিষ্কার করেছিলেন রেল ইঞ্জিন। বুঝলি কিছু?
তোমার বাষ্প দিয়ে তো আর ইঞ্জিন চলবে না বরং ওতে দু'কুটি মাংস ছেড়ে দিলে ভাল স্টু হতো।
APRIL'97
তবে, বর্তমানে ঐ জল গরম করে গাড়ি চালানোর দিন অতীত হয়ে গেছে। এখন ডিজেল পেট্রলের যুগ, পারমাণবিক শক্তির যুগ।
তুই বলতে চাস এখন এর কোন গুরুত্ব নেই? ইডিয়েট!
এ কি, কে এখানে খামোখা এক ডেকচি জল ফোটাচ্ছে?
পিসিমা! বোধহয় তোর বাষ্পীয় শক্তির পরীক্ষা দেখতে এসেছেন!

বলি এখানে কার কি গুষ্ঠির পিণ্ডি হচ্ছে- জানতে চাই!
প-পিসিমা, খুদে ওতে স্টীম্ তৈরী করে দেখছিল—
টিম তৈরী হচ্ছে!
ও-ওটা টিম নয় পিসিমা— স্টীম্।
বাড়িতে এত কিছু তৈরী করে খাওয়াচ্ছি হচ্ছে না?—আবার স্বহস্তে রন্ধন করে খেতে হচ্ছে-সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়?
?
না-না, ওটা একটা বাষ্পীয় শক্তি! জল উত্তপ্ত হলে—
রাখ তোর ঐ কেতাবী কথা! যে কোন খাদ্যই শক্তি আনে। সে টিমই হোক আর ভাত মাংসই হোক।
আসল কথা, খুদের একটু ভালমন্দ খেতে ইচ্ছে হয়েছে। বলতে লজ্জা পাচ্ছে—তাই এ সব হিজিবিজি আর কি।
হাঃ, আমার পোড়া কপালে! আজ আমি মাংসের চপ করে খাওয়াবো। তুমিও এসো পটল। এখন তোর টিম থাক কেমন?
ইঞ্জিনের শক্তির উৎস স্টীম, তেমনি দেহে শক্তি আনতে পিসিমার চপ মন্দ নয়! কি বলিস?
গজকচ্ছপ!
স্টীম আর চপ কি তাহলে এক জিনিস হল? কি জানি, এদের কথার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা মুসকিল!

## বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী

# উইলিয়ম ক্রুক্স 1832—1919

### বিবেক রায়

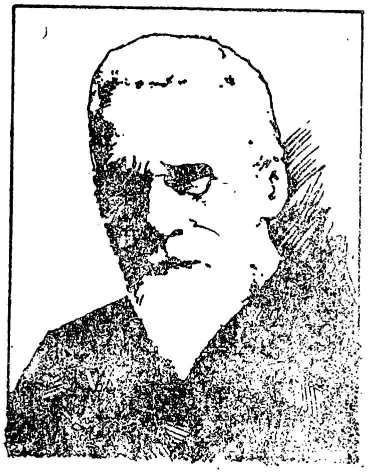

বিশ্বের বিজ্ঞান জগতে উইলিয়ম ক্রুক্স একটি সুপরিচিত নাম। বিখ্যাত এই ইংরেজ বিজ্ঞানী 'রয়্যাল কলেজ অফ কেমিস্ট্রী' থেকে স্নাতক হয়ে অক্সফোর্ডের মানমন্দিরের আবহ বিজ্ঞান দপ্তরের কর্মকর্তার পদে যোগ দেন। এরপর তিনি চেস্টার-এ রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপনা শুরু করেন। রসায়ন ছাড়াও পদার্থ বিজ্ঞানে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া টাকায় লণ্ডনের কেনসিংটন পার্ক গার্ডেনে ক্রুক্স একটি ব্যক্তিগত গবেষণাগার স্থাপন করেন।

উইলিয়ম ক্রুক্স দীর্ঘকাল বিজ্ঞান-সাংবাদিকতার কাজ করেছিলেন। 1857 সালে 'জার্নাল অফ দ্য লণ্ডন ফটোগ্রাফিক সোসাইটি'তে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহলে সেটি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে। রয়্যাল সোসাইটি থেকে আর্থিক সাহায্য পেয়ে ক্রুক্স চাঁদের কয়েকটি সুন্দর ফটো তোলেন এবং সেগুলি লণ্ডনের ফটোগ্রাফিক জার্নালে প্রকাশিত হয়। 1864 সালে উইলিয়ম ক্রুক্স একটি বিখ্যাত বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু এর পাঁচ বছর আগেই তিনি 'কেমিক্যাল নিউজ' নামে একটি বিজ্ঞান পত্রিকা প্রতিষ্ঠা করেন এবং 1906 সাল পর্যন্ত ঐ পত্রিকাটি তিনি সম্পাদনা করে যান।

1861 খ্রীস্টাব্দে 'স্পেকট্রোস্কোপ' নামক যন্ত্রের সাহায্যে ক্রুক্স 'থ্যালিয়াম' নামে একটি মৌল আবিষ্কার করেন। 90 পরমাণু ক্রমাংক বিশিষ্ট এই মৌলটির অবস্থান পর্যায় সারণীর সপ্তম পর্যায়ে। এটি অ্যাক্টিনাইডস গোষ্ঠীভুক্ত মৌল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এইটিই তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য অবদান। এই আবিষ্কারের পর ক্রুক্স-এর মর্যাদা বেড়ে যায়। সরকারী ও বেসরকারী অনেক বিজ্ঞান সংস্থা ফলিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে ক্রুক্স-এর পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করতে শুরু করে।

ওয়েল্ডিং-এর কাজে নিযুক্ত শ্রমিকেরা চোখে যে গগল্স ব্যবহার করে, তা তাপ ও অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করে। ঐ গগল্স-এর সঙ্গে ক্রুক্স-এর নাম জড়িত।

বায়ু শূন্য নলে তড়িৎক্ষরণ ঘটিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার জন্যে এক বিশেষ ধরনের কাচনল উদ্ভাবন করেছিলেন ক্রুক্স। তাঁর উদ্ভাবিত ঐ কাচনল আজও তাঁর নামানুসারে ক্রুক্স-এর নল নামে পরিচিত। ক্ষরণ নলের মধ্যে গ্যাসের চাপ কমে এক মিলিমিটার-এর নিচে নামালে নলের মধ্যেকার আলোর দাগগুলির (striations) সংখ্যা কমতে থাকে এবং তাদের ভেতরের ফাঁকও বৃদ্ধি পায়। তখন ঋণাত্মক দীপ্তি ক্যাথোডকে ত্যাগ করে গ্যাসের মধ্যে চলে আসে এবং ক্যাথোড ও ঋণাত্মক দীপ্তির মধ্যে একটি অন্ধকারময় স্থানের সৃষ্টি হয়। ঐ অন্ধকারময় স্থানটিকে ক্রুক্স-এর অন্ধকারময় স্থান নামে অভিহিত করা হয়। উইলিয়ম ক্রুক্স ক্যাথোড রশ্মির ধর্ম পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্যে তাঁর আবিষ্কৃত বিশেষ ধরনের কাচনল ব্যবহার করেছিলেন। ক্রুক্স-নল ব্যবহার করেই তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে ক্যাথোড রশ্মি সরলরেখায় চলে। 1895 সালে ঐ কাচনলের সাহায্যেই বিজ্ঞানী রণ্টজেন এক্স রশ্মিকে সনাক্ত করার বিখ্যাত পরীক্ষাটি সমাধা করেন। আবার সেই ক্রুক্স নলের সাহায্যেই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড ইলেকট্রনের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের পরীক্ষা করেন।

অতি সামান্য পরিমাণ তাপের অস্তিত্ব নিরূপণের জন্যে ক্রুক্স 'রেডিওমিটার' নামে একটি যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন। আজও অনেক পরীক্ষাগারে এ যন্ত্রটি ব্যবহৃত হয়।

আজীবন বিজ্ঞান সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপে উইলিয়ম ক্রুক্সকে 1897 সালে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। 1919 খ্রীস্টাব্দে 4ঠা এপ্রিল তারিখে লণ্ডনে উইলিয়ম ক্রুক্স-এর দেহাবসান ঘটে কিন্তু বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্যে বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর নাম আজও অমর হয়ে আছে।

ইন্দা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

# প্রকৃতি বিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

নন্দলাল মাইতি

কিশোর বয়স বড় কঠিন সময়,—গঠনের সময়। এ-সময় মনের অলিগলির সঠিক খবর সহসা ধরা পড়ে না। কি হতে চাই আর কি হতে চাই না তা বোঝা খুব মুশকিল। অথচ এ-সময় প্রবণতা অনুযায়ী সঠিক পথ নির্বাচন করতে না পারলে জীবন বরবাদ হয়ে যায়। তাই ছোটবেলা থেকেই মহাপুরুষ, কৃতী ও সফল মানুষদের জীবনী পাঠ একান্ত দরকার। এই পরিপ্রেক্ষিতে ছোট-বড় সবার পক্ষে যে কৃতী নিঃস্বার্থ মানুষটির কথা মনে পড়ছে তিনি ডঃ গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য—গোপাল ভট্টাচার্য নামে যিনি অধিক পরিচিত।

গোপালচন্দ্রকে ছোটবেলা থেকে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয়েছিল। তিনি মাত্র পাঁচ বছর কয়েক মাস বয়সে বাবাকে হারান। সংসারের জ্যেষ্ঠ সন্তান তিনি। তাই বয়স বাড়ার পর থেকেই একদিকে বাবার যজমানী বৃত্তি, আর অন্যদিকে পড়াশোনা এই দুটি কাজই তাঁকে করতে হয়েছিল। অনেক দিন ভাত খেয়ে স্কুলে যেতে সময় পর্যন্ত পাননি, টিফিনে এসে খেয়েছেন। এ-সব তাঁর কিশোর বয়সের ঘটনা।

জন্ম তাঁর ফরিদপুর জেলার লোনসিং গ্রামে, 1895 সালে। গ্রামের স্কুল থেকেই 1913 সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। পড়াশোনার খুব ইচ্ছে। পড়াশোনার প্রতি এই গভীর অনুরাগ তিনি মা শশিমুখীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। অপরের সাহায্যের উপর নির্ভর করে মৈমনসিং-এর আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন। কিন্তু পড়াশোনা শেষ করতে পারেননি অভাব-অনটনের জন্যে। প্রথাগত কলেজী শিক্ষা পাননি বটে, কিন্তু এবার থেকে তাঁর প্রকৃত শিক্ষা শুরু হলো; তাঁর জিজ্ঞাসু, অনুসন্ধিৎসু ও কৌতূহলী মন অপার আনন্দে বাধা-বাঁধন হারা হয়ে প্রকৃতির অনন্ত বিস্তৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ নিতে থাকেন।

যার যেমন প্রবণতা ও দৃষ্টিভঙ্গী সে তেমনভাবে প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলতেন, 'ভগবান সর্বদা জ্যামিতিকরণ করে চলেছেন'; বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক-গণিতজ্ঞ দেকার্তে তা প্রমাণ করে দেখালেন ভগবান কেমন করে জ্যামিতিকরণ করেছেন। অর্থাৎ বিশ্ব যে একটি জ্যামিতিক আকার ছাড়া আর কিছু নয়, তা তাঁর মননে ধরা পড়ল। আবার বিখ্যাত জার্মান গণিতজ্ঞ ক্রোনেকার বলতেন, 'ভগবান সর্বদা পাটী গাণিতিকরণ করে চলেছেন'। এমনি করে মানব সভ্যতার বিবর্তনে কত মনীষীর ধারা এসে মিশেছে। এই ধারায়—মানব সভ্যতার আর একটি স্রোতধারায় গোপালচন্দ্রের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ এসে মিশল। কি সেই পর্যবেক্ষণ?

তাঁর কথায় বলা যাকঃ 'প্রায়ই বন-জঙ্গলে, খাল-বিল, এঁদো পুকুরের ধারে কীট-পতঙ্গ, পাখী এবং ছোট ছোট মাছ ও জলপোকার গতিবিধি লক্ষ্য করে কাটিয়ে দিতাম। গাছপালারও অনেক কিছুই নজরে পড়েছিল। কিন্তু অনেক কিছুর তাৎপর্য বোঝবার ক্ষমতা ছিল না। এইসব সাধারণ দেখাই পরবর্তীকালে আমার কাজে অনেকটা সহায়ক হয়েছিল।' গোপালচন্দ্র পিঁপড়ে, মাকড়শা ইত্যাদির কার্যকলাপ ঘণ্টার পর ঘণ্টা লক্ষ্য করতেন।

ব্যাঙাচি নিয়ে গবেষণা করার সময় গোপালচন্দ্র বলেছেন, 'পরিবেশ অনুযায়ী দৈহিক রঙের বদল হয় কিনা দেখবার জন্য বিভিন্ন কাচের ট্যাঙ্কে অনেকগুলি ব্যাঙাচি রেখে-ছিলাম। একটি জলাধারে পেনিসিলিন মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ...দিন দশেক পরে দেখা গেল যে ট্যাঙ্কে পেনিসিলিন দেওয়া ছিল তার ভিতরকার ব্যাঙাচিরা একই রকম আছে, হ্রাস বৃদ্ধি কিছুই ঘটেনি। অথচ অন্যান্য ট্যাঙ্কের ব্যাঙাচিরা অধিকাংশই ব্যাঙাচিত্ব ঘুচিয়ে ব্যাং হয়ে গেছে এবং জলে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে।...ব্যাপারটা কি? আরও 15 দিন কেটে গেল, কিন্তু পেনিসিলিনের ব্যাঙাচির সেই একই অবস্থা, কোন পরিবর্তন নাই।'

গোপালচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ তারকমোহন দাস বলেন,—'গোপালবাবু জীব বিজ্ঞান সংক্রান্ত অধিকাংশ লেখার বিষয় তাঁর নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঝুলি থেকে যোগাড় করেছেন। এই প্রসাদগুণে তাঁর লেখা ছোট বড় সকলের কাছেই অনন্য।...দেখার মত করে দেখতে শেখাই বিজ্ঞান শিক্ষার প্রথম সোপান হওয়া উচিত, কিন্তু কোথাও কোন পাঠ্য পুস্তকে ল্যাবরেটরীতে তা শেখানো হয় না।'

ঠাকুরাণীচক, হুগলী।

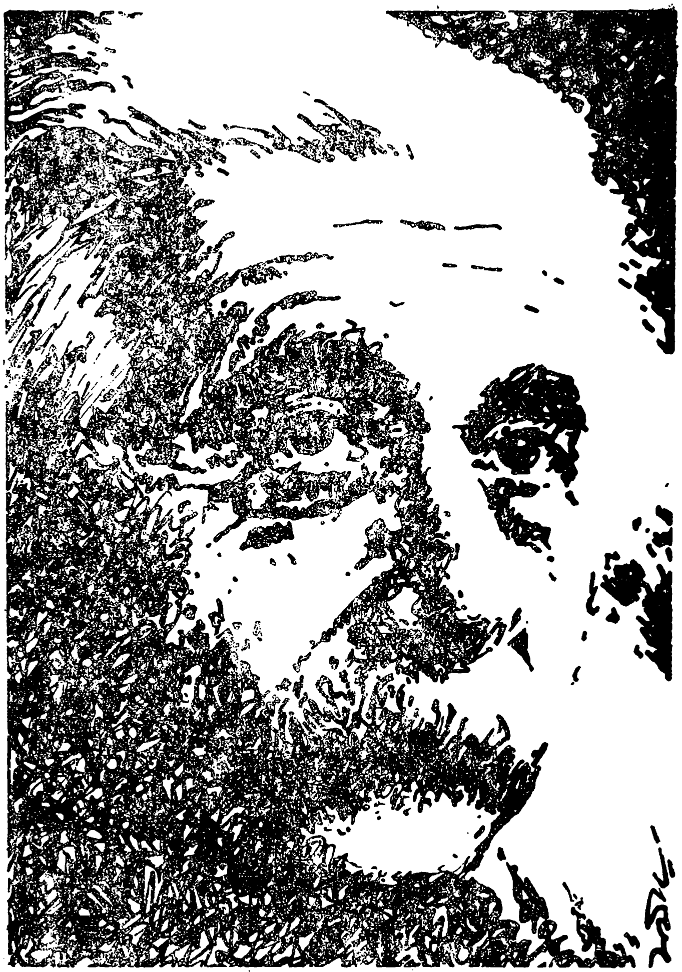

# আইনস্টাইনের চিঠি

## সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

গত বছর ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে খবরের কাগজে দেখলাম, আইনস্টাইনের একখানা চিঠি নীলামে বিক্রী হয়ে গেলো। এই চিঠিখানি লেখা হয়েছিল তদানীন্তন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে। কি সেই চিঠি, কেন লিখেছিলেন এবং তার ফলাফল কি হয়েছিল সে কথা পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরবার জন্যে আমার এই প্রয়াস। ঐ বিখ্যাত এবং ভয়ানক চিঠিখানি লেখা হয়েছিল 2রা আগস্ট 1939 সালে, চিঠিখানির মুসাবিদা করেন বৈজ্ঞানিক লিওজিলার্ড এবং সেটি সই করেছিলেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন। এই জিলার্ড সম্বন্ধে প্রথমে কিছু বলা দরকার। জিলার্ডের জন্ম 1898 সালে হাঙ্গেরীতে। 1914 সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে 16 বছরের জিলার্ডকে সামরিক আইন অনুসারে বাধ্যতামূলকভাবে সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়। যুদ্ধের বীভৎসতা এবং সামরিকবাহিনীর অকথ্য অত্যাচার তার জীবনকে এমনভাবে পীড়িত করেছিল যে তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিয়েছিল প্রচণ্ড সমরবিরূপতা। তিনি ছিলেন জার্মানীর সেই বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় গোটেনজেনের ছাত্র এবং তার শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন আইনস্টাইন, প্ল্যাঙ্ক, মেস্ট, ভসলে এঁদের মত নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের। এসব 1930 দশকের প্রথম দিকের কথা।

* * *

ওই চিঠিখানির ফলেই আমেরিকাতে পরমাণু বোমা তৈরির আন্দোলন সুরু হয়েছিলো। সুতরাং পরমাণুর গঠন সম্পর্কে একটু আলোচনা দরকার বইকি।

জড়বস্তুর সব থেকে ছোট টুকরো হল পরমাণু। খৃস্টপূর্ব 430 বছর আগে গ্রীক বৈজ্ঞানিক ডিমোক্রিটাস এই পরমাণুবাদের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বললেন পদার্থের আদিতে আছে এক ধরনের কণা—তিনি তার নাম দিলেন অ্যাটম, তার কোন বদল নেই। গ্রীক ভাষায় অ্যাটমস কথার অর্থ হল যা অবিভাজ্য। অর্থাৎ কোন একটা ধাতুকে নিয়ে যদি ভাঙ্গতে আরম্ভ করা যায়,

অর্থাৎ প্রথমে দুটুকরো তারপর একটা আধখানা নিয়ে তাকে আবার দুটুকরো, আবার আধখানা নিয়ে তাকে দুটুকরো এইভাবে যদি টুকরো টুকরো করা যায় অর্থাৎ কল্পনাতে শেষ ক্ষুদ্রতম অংশটুকুতে এসে যখন শেষ করব, যখন তাকে আর ভাঙ্গা যাবে না—তাকেই বৈজ্ঞানিকরা নাম দিয়েছেন পরমাণু। এবং ঐ পরমাণুর মধ্যেই আছে ঐ মৌলধাতুর সমস্ত গুণাগুণ। একে আর ভেঙ্গে ছোট করা যাবে না এবং এটা একটা নিরেট বস্তু।

গ্রীক দার্শনিক থেকে শুরু করে আঠারো শতকের শেষ দিক পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় বাইশশো, তেইশশো বছর ধরে পন্ডিতদের ধারণা ছিল প্রতিটি মৌল পদার্থের পরমাণু নিরেট অবিভাজ্য ও অপরিবর্তনশীল। কিন্তু আঠারো শতকের শেষ দিকে এমন কতকগুলি আবিষ্কারের ঘটনা ঘটলো যাতে পূর্বতন ঐ ধারণার পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য করল।

আবিষ্কার হল বিদ্যুতের—জানা গেলো বিদ্যুত চলাচলের কারণ ইলেকট্রনের প্রবাহ, আর এই ইলেকট্রন বেরুচ্ছে ওই পরমাণুর মধ্যে থেকেই।

1896 সালে ফরাসী দেশের পদার্থবিজ্ঞানী আঁতোয়-হেনরি বেকেরেল আর তার দুই বিশিষ্ট ছাত্রছাত্রী পিয়েরী কুরী ও তরুণী রসায়নবিদ মারী শক্লোদোভ্স্কা-এঁর জন্ম পোলান্ডে, যিনি কিছুদিন আগে পিয়েরীকুরীকে বিবাহ করে মাদাম কুরী হয়েছেন, ইউরেনিয়াম থেকে নির্গত অদ্ভুত বিকিরণ নিয়ে গবেষণায় রত হলেন। পটাসিয়াম ইউরানিল সালফেট—যা হচ্ছে ইউরেনিয়াম পরমাণুযুক্ত একটি যৌগিক পদার্থ—এর গুণধর্ম বিশ্লেষণ করে দেখছিলেন বেকেরেল। গবেষণাগারে টেবিলের উপর রাখা ছিল ঐ যৌগিক পদার্থ আর নিচে ড্রয়ারে রাখা ছিল কালো কাগজে মোড়া ফটোগ্রাফিক প্লেট—যেগুলি তীব্র বিকিরণের প্রভাবে গাঢ় কালো হয়ে গিয়েছিলো। এঁরা তিনজনে সন্ধান পেলেন ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয় বিকিরণের অদ্ভুত ঘটনা। ইউরেনিয়ামের ওই বিকিরণক্ষমতাকে মারী কুরীই প্রথমে তেজস্ক্রিয় আখ্যা দেবার প্রস্তাব করেন। এরপর 1898 সালের জুলাই মাসের কাছাকাছি কুরী দম্পতি আবিষ্কার করলেন রেডিয়াম—যার তেজস্ক্রিয়তা সমপরিমাণ ইউরেনিয়ামের চেয়ে প্রায় চারশগুণ বেশি। আরও চার বছর পর 1903 সালে কুরী দম্পতি চোখে দেখার মত বিশুদ্ধ রেডিয়াম সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন। 1903 সালে মারী কুরী তাঁর গবেষণার সারাংশ লিখে সেটিকে পি, এইচ, ডি থিসিস হিসাবে শেষ করলেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে বোধহয় সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ডক্টরেট থিসিস্। মারী কুরী সর্ব সম্মানে ভূষিতা হয়ে দুবার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার গৌরব অর্জন করেন। 1903 সালে ও 1911 সালে। 1903 সালে মারী কুরী ও তাঁর স্বামী পিয়েরী কুরী এবং বেকেরেল একত্রে পদার্থবিদ্যার নোবেল-পুরস্কার পেলেন। 1911 সালে রসায়নে মাদাম মারী কুরী একাই এই পুরস্কার আবার পেলেন—কারণ তার স্বামী 1906 সালে এক পথ দুর্ঘটনায় মারা যান।

রেডিয়াম থেকে যে নীলচে আভা বেরোয় কুরী দম্পতি পরীক্ষা করে দেখলেন রেডিয়ামের পরমাণুগুলি ক্রমাগত নিজে থেকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যাচ্ছে আর পরমাণুর অবিভাজ্য কেন্দ্র থেকে শক্তি ও কণা বেরিয়ে আসছে। পরমাণু-ভাঙ্গা গড়ার মধ্য দিয়ে শক্তি ঢুকছে, বেরোচ্ছে, পাওয়া যাচ্ছে উত্তাপ আর তেজস্ক্রিয়তা। সুতরাং পুরাকালের সেই আস্ত নিটোল পরমাণুর ধারণা বদলে গিয়ে খুলে গেছে তার মধ্যেকার এক বিচিত্র রহস্যময় জগৎ।

তৃতীয় ঘটনা হল 1897 সালে ব্রিটিশ পদার্থবিদ স্যার জোসেফ জন টমসন কেমব্রিজের ক্যাভেণ্ডিস পরীক্ষাগারে গবেষণা করে জানালেন পরমাণু নিরেট নয়. তার অন্ততঃ দুটি অংশ রয়েছে। মাঝখানে রয়েছে নিউক্লিয়াস, আর বাইরে আছে কিছু ঋণাত্মক (নেগেটিভ) বিদ্যুত সম্পন্ন গতিশীল ঘূর্ণ্যমান ইলেকট্রন। ইনিই কেমব্রিজে এই বিখ্যাত গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেন এবং 1766 খৃঃ হাইড্রোজেনের আবিষ্কারক হেনরী ক্যাভেণ্ডিসের নামানুসারে এই গবেষণাগারের নামানুকরণ করেন। 1906 সালে ইনি নোবেল পুরস্কার পান।

সুতরাং পরমাণু আর অবিভাজ্য রইল না।

কিন্তু পরমাণু তো বিদ্যুত বিচারে নিরপেক্ষ অর্থাৎ ইলেকট্রোনিউট্রাল—তাহলে ইলেকট্রনের ঋণাত্মক বিদ্যুত পরমাণুকে তো বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ থাকতে দেবে না। 1918 সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত (1908) বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড ঐ ক্যাভেণ্ডিস গবেষণাগারে পরীক্ষার পর জানালেন নিউক্লিয়াসের ভেতরে রয়েছে ধনাত্মক বিদ্যুতবহ প্রোটন। প্রতিটি প্রোটনের ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ প্রতিটি ইলেকট্রনের ঋণাত্মক বিদ্যুতের সমান। ফলে প্রতিটি পরমাণুতে প্রোটন আর ইলেকট্রন থাকবে সমান সংখ্যায়।

1932 সালে জেমস চ্যাডউইক আবিষ্কার করলেন নিউট্রন—ঐ একই পরীক্ষাগারে। নিউট্রনে কোন বিদ্যুত নেই, তাই তার সংখ্যা যতই হোক না কেন পরমাণুটা বিদ্যুত বিচারে নিরপেক্ষ হবে। এই নিউট্রনই হল পরমাণুর কেন্দ্রস্থলের অনাবিষ্কৃত অংশ এবং পরমাণু বিভাজনের মূল হাতিয়ার। এই আবিষ্কারের জন্যে চ্যাডউইক 1935 সালে নোবেল পুরস্কার পেলেন। ডেনমার্কের পদার্থবিদ ঋষি-প্রতিম 1922 সালে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত নীলস্ বোর পরমাণু ও নিউক্লিয়াসের মডেল সম্বন্ধে একটি রূপরেখা উপহার দিলেন বিজ্ঞানী সমাজকে।

[ পরের অংশ 39 পৃষ্ঠায় ]

[ নয় ]

আজ আমার বড় আনন্দের দিন। আমার কাকুতিমিনতিতে মন গলেছে জিরার। শহর দেখানোর জন্যে নিয়ে এসেছে খাঁচার বাইরে এবং বাড়িটারও বাইরে। এ বাড়ি একটা গবেষণা কেন্দ্র। নাম, ইন্সটিটিউট ফর অ্যাডভান্স বায়োলজিক্যাল স্টাডি।

অবশ্য অনেক দ্বিধা করার পর রাজি হয়েছে জিরা। আমি কোন গ্রহের মানুষ, এটা বোঝাতে হয়েছে অনেক কষ্টে। বোঝবার পরেও মন থেকে সন্দেহ তাড়াতে পারেনি। দোষ দিতে পারিনি। ওর পরিস্থিতিতে আমার মনের অবস্থাও একই রকম হত। পৃথিবীতে মানুষ আর বাঁদর কি অবস্থায় আছে, আমার মুখে সেই বর্ণনা শুনে দারুণ আঘাত পেয়েছে জিরা। পরে বলেছিল, বেশ কিছুদিন আমার একটা কথাও নাকি বিশ্বাস করেনি—ধাপ্পাবাজ অথবা জাদুকর বলেই মনে করেছিল আমাকে। কিন্তু তথ্য আর প্রমাণ দিয়ে শেষ পর্যন্ত ওর মন জয় করেছিলাম। আমার মুক্তির জন্যে কোমর বেঁধে লেগেছিল জিরা। তবে কাজটা যে কঠিন, তাও বলে রেখেছিল। ইতিমধ্যে একদিন বিকেলের দিকে এল আমাকে নিয়ে শহর পরিক্রমার জন্যে।

আনন্দে বুক ধড়াসধড়াস করে উঠেছিল আবার খোলা বাতাসে বেরোবার সুযোগ পেতে যাচ্ছি শুনে। উৎসাহ একটু ঝিমিয়ে গেল যখন দেখলাম গলায় বকলস এঁটে শেকল হাতে রেখেছে জিরা। খাঁচা থেকে আমাকে বের করে গরিলা দুজনই চামড়ার বেল্ট লাগিয়ে দিল গলায়—শেকলের প্রান্তভাগ দিল জিরার হাতে।

গলিপথের অন্ধকার নির্জন অঞ্চলে হেসে ফেলল জিরা। বললে—পৃথিবীর মানুষরা নিশ্চয় বাঁদরদের এইভাবে গলায় বকলস এঁটে চেনে বেঁধে নিয়ে যায়।

'সব সময়ে নয়,' বলেছিলাম আমি।

ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিল জিরা। বলেছিল, কিছু পোষা মানুষকে এইভাবে চেন লাগিয়ে বাইরে নিয়ে যাওয়ার রেওয়াজ আছে এখানকার সমাজে। খুব পোষ মেনে গেলে অবশ্য তার আর দরকার হয় না। আমারও এ অবস্থার অবসান ঘটবে শীগগিরই।

“বাচ্চাকাচ্চা দেখলে, অথবা পাশ দিয়ে লোকজন গেলে দাঁত খিঁচোতে যেও না কিন্তু” বলেই হেসে ফেলেছিল জিরা “—এই দ্যাখো। অন্য মনস্ক হয়ে আবার তোমাকে আঘাত দিয়ে বসেছি। তোমার মন মেজাজ বাঁদরদের মতই একেবারে ভুলে গেছিলাম।”

আহা! কি উপমা!

বেরিয়ে এলাম বাড়ি ছেড়ে গলায় বকলস বাঁধা অবস্থায়। ইউনিফর্ম পরা বিরাটকায় একজন গরিলা দারোয়ান সকৌতুকে চেয়ে রইল আমার দিকে। স্যালুট করল জিরাকে। চোখে ধোঁয়া দেখলাম ফুটপাতে এসে। মাস তিনেকের খাঁচার অন্ধকারে থেকেছি, পরিশ্রম করতে হয়নি। বেটেলগুজের জোরালো সূর্যকিরণে চোখ ধাঁধিয়ে গেল সেই কারণেই। মাথা ঘুরতে লাগল পথশ্রমে। বুক ভরে টেনে নিলাম উষ্ণ বাতাস। অস্বস্তি বোধ করলাম স্বল্পবাস পরনে থাকায়। খাঁচায় এই পোশাক সয়ে গেছিল। কিন্তু রাস্তাঘাটে নিজেকে কিম্ভূতকিমাকার মনে হল। বাঁদররা আশপাশ দিয়ে যাচ্ছে আর সমানে প্যাট প্যাট করে আমার দিকে তাকাচ্ছে। পোশাক পরাতে চায়নি জিরা নিজেই। তাতে নাকি আরও খাপছাড়া লাগবে—সার্কাসের পোষা মানুষের মত। কথাটা ঠিকই। পথচারীরা আমাকে দেখছে আমার স্বল্পবাসের জন্যে নয়—আমি মানুষ বলে। ফরাসী শহরে পথেঘাটে বাঁদর দেখলে মানুষ যেভাবে তাকায়, ঠিক সেই ভাবে। বড়রা দাঁত বার করে হেসে চলে যাচ্ছে। ছোটরা ঘিরে ধরছে। উল্লাসে

হৈ চৈ করছে। তাড়াতাড়ি নিজের গাড়িতে আমাকে উঠিয়ে দিল জিরা। আমি বসলাম পেছনের সিটে। ও বসল স্টিয়ারিং হুইলের সামনে। আস্তে আস্তে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেল শহরের রাস্তা দিয়ে।

এ গ্রহে নামবার সময়ে চকিতে দেখেছিলাম যে শহরকে, এখন তাকে দেখলাম খুব কাছ থেকে। বাঁদর পথযাত্রী, বাঁদর মোটর চালক, বাঁদর দোকানদার, বাঁদর কারবারী, বাঁদর পুলিশ। বাড়ি ঘরদোর পৃথিবীতে আমাদের শহরের বাড়ি-ঘরদোরের মতই। রাস্তাঘাটও তাই; একটু যা নোংরা। গাড়ির ভিড় তেমন নেই—যেমন আছে আমাদের শহরে। অবাক লাগল রাস্তা পেরোনোর কায়দা দেখে। হেঁটে পেরোচ্ছে না। রাস্তার ওপরকার ধাতুর ফ্রেমে চার হাতপায়ে ঝুলতে ঝুলতে যাচ্ছে রাস্তার এদিক থেকে ওদিকে। দস্তানা পরা সত্ত্বেও কোনো অসুবিধেও হচ্ছে না।

শহরের অনেক কিছু দেখিয়ে একটা ফটকের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল জিরা। ভেতরে দেখতে পেলাম অনেক ফুলের গাছ।

"বলল—বাগানে এলাম। বেড়াতে বেড়াতে কথা হবে। মিউজিয়ামটাও দেখাবো—পরে। তার আগে কিছু সিরিয়াস কথাবার্তা বলে নেওয়া যাক—কেননা লোকজন এখানে কম।"

**ষড়যন্ত্র**

বাগানে পাশাপাশি হাঁটছি দুজনে। দূরে দূরে দেখতে পাচ্ছি দু-একজন বাঁদর গাছের তলা দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ ডাল ধরে দুলে উঠে পড়ছে গাছে। আবার নেমে আসছে লাফ দিয়ে। বড় বিচিত্র দৃশ্য!

জিরা বললে—"শোনো, সোরোর গ্রহে তুমি সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে পড়তে চলেছ। সেই কথা বলবার জন্যেই তোমাকে এখানে নিয়ে এলাম।"

"কি বিপদ, জিরা?"

"যে লণ্ডে করে এ গ্রহে নেমেছো, সেটা পেয়েছে আমাদের বৈজ্ঞানিকরা।"

"আগেই বলেছি তোমাকে—"

"কিন্তু যন্ত্রপাতি দেখে বুঝতে পারছে, বাঁদরদের চেয়ে উন্নত কোনো প্রাণী লণ্ডে করে এসে নেমেছে এই গ্রহে।"

"ভালই তো—"

কিন্তু সে প্রাণীদের দেখতে যে মানুষের মত, তা কল্পনাও করতে পারেনি।"

"তাহলে আমার পরিচয়টা দাও।"

"তাতে বিপদ আছে। জেয়াসকে দেখলে তো? তার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি ট্রেনিং পাওয়া মানুষ ছাড়া কিছুই নও। যা শিখেছো, তাই করে যাও। নিজস্ব ধীশক্তি কিছু নেই। অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছি—কিন্তু নির্বোধটার মাথায় কিছু ঢোকাতে পারিনি।"

"গোল্লায় যাক জেয়াস, আমাদের মহাকাশযান সোরোর গ্রহকে পাক দিচ্ছে, তার খবর পেয়েছো?"

ভুরু কুঁচকে জিরা বললে—"দিচ্ছে নাকি?' আমরা এখনো জানি না। কৃত্রিম উপগ্রহ আমরা একটা বানিয়েছিলাম। শূন্যেও পাঠিয়েছিলাম—তাতে ছিল একজন মানুষ। ফিরিয়ে আনা সম্ভব ছিল না বলে ধ্বংস করে দিতে হয়েছে।

"মানুষদের তাহলে এই কাজেই লাগাও তোমরা?"

তাতো বটেই। জঙ্গল থেকে এত মানুষ ধরে আনা হয় তো এক্সপেরিমেন্টের জন্যেই। ওদের ব্রেনের সঙ্গে আমাদের ব্রেনের মিল আছে বলেই গরিলারা যায় ওদের পাকড়াও করতে। শিকার করার লোভটা ছাড়তে পারে না—খামোকা বেশকিছু মানুষকে গুলি করে মারে। স্টুপিড কোথাকার।"

"বাঁচিয়ে রাখলে এক্সপেরিমেন্টের সুবিধে হত, তাই না?" ব্যঙ্গের সুরে বলেছিলাম আমি—"যেমন আমি।"

জিরা গম্ভীর হয়ে বললে—"আমার জন্যেই জেয়াসের খপ্পরে এখনো তুমি পড়োনি।"

"কি হবে খপ্পরে পড়লে?"

"তোমার ব্রেন নিয়ে পরীক্ষা করবে। কেটে ছেঁটে খুলে নিয়ে দেখবে এত এলেম তোমার মধ্যে এল কি করে।"

"ওরে বাবা।"

"কর্নেলিয়াস, যাকে আমি বিয়ে করব, সেই শুধু জানে তুমি কে। জেয়াস জানলে আর রক্ষে ছিল না। কর্নেলিয়াস তোমাকে দেখবে বলেই বাগানে আজ এসেছে—তোমাকেও এনেছি।"

"কোথায় সে?"

"এখুনি দেখতে পাবে। তার আগে একটা প্ল্যানের কথা বলে রাখি। তুমি যে অন্য গ্রহের প্রাণী, একথা বললে জেয়াস কেন, কেউই বিশ্বাস করবে না। কিন্তু শীগগিরই একটা বিরাট সম্মেলন হবে। অনেক বৈজ্ঞানিক ছাড়াও পাবলিক থাকবে সেখানে। সেইখানে তুমি তোমার স্বরূপ দেখাবে।"

"কেন, জিরা?"

"গরিলারা, ওরাংওটাংরা আর শিম্পাঞ্জীরা যতই একরোখা আর বদ্ধ ধারণা নিয়ে থাকুক না কেন, জনমতের কাছে মাথা নিচু করতে বাধ্য হয়। পাবলিক এখানে সবচেয়ে বড় শক্তি'। তুমি সেই পাবলিককে যদি দলে টানতে পারো তোমার মগজের শক্তি দেখিয়ে—এ যাত্রা বেঁচে গেলে" শিউরে উঠলাম—"কি করতে হবে বলো।"

"তার আগে কর্নেলিয়াসের সঙ্গে কথা বলে নাও। ঐ তো ও দাঁড়িয়ে আছে।

ফিটফাট পোশাক পরা বুদ্ধিদীপ্ত একজন শিম্পাঞ্জী এগিয়ে এল আমাদের দিকে। চোখেমুখে প্রতিভার স্ফুরণ। বয়স

বুদ্ধিদীপ্ত একজন শিম্পাঞ্জী এগিয়ে এল আমাদের দিকে।

জিরার চাইতে একটু বেশি। কিন্তু এই বয়েসে নামী বৈজ্ঞানিক খুব কম জনই হতে পারে।

হঠাৎ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম—"কিরকম আছেন বলুন ?"

থতমত খেয়ে ঝট করে সরে গেল কর্নেলিয়াস। আমার হাতখানা যেন জ্যান্ত সাপ—নাগালের মধ্যে এল না। আমতা আমতা করে বললে জিরাকে—"এ আবার কি ?"

"এরই নাম ইউলিসি মেরো—পৃথিবী গ্রহ থেকে এসেছে, যার কথা তোমাকে বলেছিলাম।"

"তাহলে সব সত্যি ?"

"তোমাকে মিথ্যে কখনো বলেছি ?"

আস্তে আস্তে কর্নেলিয়াস হাত বাড়িয়ে দিল আমার দিকে। করমর্দন করলাম সানন্দে। বললাম—"এই রকম পোশাকে সামনে আসতে হল বলে কিছু মনে করবেন না।"

হেসে ফেলল জিরা—"মেরো শুধু পোশাক নিয়েই ভাবছে। ব্রেনটা যে যেতে বসেছে, সে ভাবনা নেই।"

হাসল কর্নেলিয়াসও। বললে—"জিরার প্ল্যান আমি শুনেছি। সব ব্যবস্থা আমি করব। আমি নিজেও বাঁদর-দের আদি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করছি। বিষয়বস্তু এখন বলব না। অনেক কিছুই নির্ভর করছে জেয়াসকে টক্কর দেওয়ার ওপর।"

পৃথিবী সম্বন্ধে অনেক খোঁজ খবর নেওয়ার পর বিদায় নিল কর্নেলিয়াস। জিরা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল খাঁচায়।

# বালিচাপা মদনমোহন

অঙ্কর্ষণ রায়

যোধপুরের কাছে তেওরি গ্রাম। তেওরির পশ্চিমে একটানা মরুভূমি। মরুভূমির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে কোয়ার্টজাইট ( quartzite ) পাথরের টিলার পাশে একটি পাথরের বাড়ি দেখতে পেলাম। বাড়ির মধ্যে কেউ আছে বলে মনে হল না। আমার সঙ্গী বিষেণলাল বললে, "এটা একটা পোড়োবাড়ি বলে মনে হচ্ছে।"

"পোড়োবাড়ি!" আমি খুশি হয়ে উঠি: "তা হলে এখানেই আমাদের আস্তানা করা যাক।"

"নিশ্চয়ই। এমন রেডিমেট আশ্রয় যখন ভগবান জুটিয়ে দিলেন..."

"কে ওখানে?" বাজখাঁই গলার আওয়াজে বিষেণরামের মুখের কথা মুখেই থেকে যায়। আমরা দুজনেই চমকে উঠে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করি।

আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন একজন আশি পঁচাশি বছরের থুথ্থুরে বুড়ো। তাঁর পরনে রাজস্থানীদের মত ঢিলে-ঢালা পোশাক, মাথায় বিশাল পাগড়ি, হাতে লাঠি। আমাদের দুজনের মুখের ওপরে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে তিনি বললেন, "কোথা থেকে আসছ তোমরা? কি মতলবে এসেছ এখানে?"

"আমরা কলকাতা থেকে আসছি।" আমি জবাব দিলাম, "এখানে বালির নিচে সীসা-দস্তার ভাণ্ডার চাপা আছে তাই খুঁজছি। আমাদের মনে হয়েছিল এই বাড়িটা একটা পোড়ো বাড়ি, তাই এখানে এসেছিলাম আশ্রয়ের খোঁজে।"

"পোড়ো বাড়িই বটে।" বৃদ্ধের মুখে গোঁফ-দাড়ির জঙ্গলের মধ্যে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে: "আমি একটিমাত্র ঘরে একাই থাকি, তোমরা ইচ্ছে করলে বাড়ির বাকি অংশে থাকতে পার।"

অবাক হয়ে বৃদ্ধের মুখের পানে তাকিয়ে আমি বললাম, "আপনি একা এখানে আছেন! আপনার কি কেউ নেই?"

"আছে, সবাই আছে। তারা বছর কয়েক আগে এই হাবেলি ছেড়ে তেওরিতে চলে গিয়েছে। সেখানে আমার ছেলেরা নতুন বাড়ি বানিয়েছে। আগে এখানে বেশ বড়ো একটা গ্রাম ছিল। জলের অভাব ঘটাতে গ্রাম ছেড়ে সকলে তেওরিতে চলে গিয়েছে।"

"সকলেই চলে গিয়েছে তো আপনি একা এখানে পড়ে আছেন কেন?"

"আমাদের গৃহদেবতা পড়ে আছেন বলেই আমি পড়ে আছি। তাঁকে ছেড়ে তো আমি যেতে পারি নে।"

"আপনাদের গৃহদেবতাকে এখান থেকে নিয়ে গেলেই হয়।"

"নিয়ে যাওয়ার উপায় নেই, কারণ তিনি মাটিতে চাপা আছেন। প্রায় দুশো বছর আগে এখানে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হয়েছিল, সেই ভূমিকম্পের ফলে আমাদের ঘরবাড়ি ও গৃহ-দেবতা মদনমোহনের মন্দির ধূলিসাৎ হয়, মদনমোহনের মূর্তি বালিতে চাপা পড়ে যায়। আমাদের ঘরবাড়ি নতুন করে গড়ে তুললেও মূর্তিটিকে উদ্ধার করা যায় নি। কাজেই নতুন মন্দির তৈরি করা হলেও তাতে মুর্তি স্থাপন করা যায় নি। মূর্তি না থাকলেও এই মন্দিরে আমরা মাটি চাপা দেবতার উদ্দেশে পুজো দিই।"

"মূর্তিটিকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন নি আপনারা ?"

"করেছি, ও করে যাচ্ছি। আমার নাতিরা নতুন করে খোঁজাখুঁজি করছে। কিন্তু এ পর্যন্ত কোন ফল হয় নি।"

বৃদ্ধের আমন্ত্রণ গ্রহণ করে বিষেণলাল ও আমি থেকে গেলাম তাঁর হাবেলিতে। হাবেলি না বলে তাকে হাবেলির ভগ্নাবশেষ বলা উচিত, কারণ তার দুই-তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে চূরমার হয়েছে। বাকি এক-তৃতীয়াংশের মাত্র একটি ঘরে থাকেন বৃদ্ধ যুগলকিশোর। তাঁর ঘরের পাশেই মদন-মোহনের মন্দির। যুগলকিশোরের ঘর ছাড়া আর দুটি ঘর আছে। এই অভগ্ন অংশের মধ্যে, সেই দুটি ঘরে আমরা আশ্রয় নিই।

রোজ সকালে তেওরি থেকে মদনমোহনের পুরোহিত আসেন ঘোড়ায় চেপে। তাঁকে দেখে রবীন্দ্রনাথের "বর এসেছে বীরের ছাঁদে" ছড়াটি মনে পড়ে যায়। পুরোহিত প্রত্যহ বীরের ছাঁদে এসে আমাদের তাক্ লাগিয়ে দেন। তিনি পুজোর জিনিসপত্রের সঙ্গে যুগলকিশোরের খাবার-দাবার ও পানীয় জল সঙ্গে নিয়ে আসেন।

মাঝে মাঝে আসে যুগলকিশোরের নাতি ব্রজকিশোর। সেও আসে ঘোড়ায় চেপে। সাদা ঘোড়ায় চেপে আসে বলে তেওরির লোকেরা তাকে বলে 'সাদা ঘোড়ার সোয়ার'। সে একদিন আমাদের কাছে এসে বললে, "আপনারা জিয়োলজিস্ট, মাটির তলায় লুকোনো সম্পদ খুঁজে বের করা আপনাদের কাজ। খুঁজে বের করুন আপনারা মদনমোহনের মূর্তিটাকে।"

আমি বললাম, "আমরা এখানে সীসা, দস্তা ও রূপো খুঁজতে এসেছি। এখানে সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করব। দরকার হলে খোঁড়াখুঁড়িও করব। খুঁজতে খুঁজতে ও খুঁড়তে খুঁড়তে যদি পেয়ে যাই মদনমোহনকে..."

"তা হলে আপনাদের প্রত্যেককে পাঁচশো টাকা করে ইনাম দেব।" ব্রজকিশোর আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, "মদনমোহনকে পাওয়ামাত্র আমার দাদাজিসুদ্ধ তাঁকে পাঠিয়ে দেব তেওরি। তেওরিতে মন্দির তৈরি করাই আছে, সেখানে তাঁকে বসিয়ে দেব। দোহাই আপনাদের আপনারা খুঁজে বের করুন..."

খুঁজতে শুরু করি আমরা। সীসা-দস্তা-রূপোর গুপ্ত ভাণ্ডার খুঁজে বের করার জন্য বালির সমুদ্রের মধ্যে ঘোরাঘুরি করি। যতদূর দৃষ্টি চলে বালি ছাড়া আর কিছু নেই। মাঝে মাঝে কোয়ার্টজাইটের ঢিবি চোখে পড়ছে। বালির মধ্যে জায়গায় জায়গায় কাঁটাঝোপ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দিশেহারা হয়ে পড়ি। বালির মধ্যে এমন কিছু নেই যা দেখে বালির নিচে চাপা-পড়া ধাতুর আভাস পেতে পারি।

বিষেণলাল বললে, "এইভাবে খুঁজে লাভ কি বল! বালি শুধু বালি..."

"ঠিক বলেছ।" আমি বললাম, 'বালি ,শুধু বালি দেখে জান কালি হয়ে গিয়েছে। ভেতরের খবর নেওয়া দরকার। আন্দাজে খোঁড়াখুঁড়ি করে লাভ নেই, জিয়োফিজিক্যাল পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা দরকার।"

জিয়ো-ফিজিক্যাল পদ্ধতি মানে ভূ-পদার্থবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হলে রকমারি যন্ত্রপাতি আনতে হবে। এই সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে মাটিতে কৃত্রিম ভূ-কম্পন সৃষ্টি করতে হবে, মাটির মধ্য দিয়ে চালনা করতে হবে বিদ্যুৎ বা চৌম্বকশক্তি। তারপর বিশেষ ধরনের গ্রাহক যন্ত্র দিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া দেখতে হবে। কৃত্রিম ভূ-কম্পন বিদ্যুৎ ও চৌম্বকশক্তি মাটির নিচে লুকোনো কোনো ধাতুতে প্রতিহত হলে এই গ্রাহক-যন্ত্রের মধ্যে সাড়া জাগবে।

কিন্তু এ জাতীয় কাজের ব্যবস্থা করতে সময় লাগবে। আপাততঃ বালি দেখা ও পরীক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। ঝুঁকে পড়ে বালি পরীক্ষা করি, বালির রঙ দেখি, কয়েক মিনিট অন্তর অন্তর বালির নমুনা তুলে এনে আমার ছোট্ট পোর্টেব্‌ল ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করি। টিনের পাত-বসানো কাঠের বাক্সের মধ্যে এই ল্যাবরেটরিটাকে তৈরি করে দিয়েছেন আমাদের চীফ কেমিস্ট ডঃ চৌধুরী। তার মধ্যে রকমারি রাসায়নিক পদার্থ ছাড়া আছে টেস্ট-টিউব বিকার, ফানেল ও কেরোসিন-বার্নার। তা ছাড়া আছে ছোট কাঠের ডেস্ক। এই ডেস্কের ওপরে বার্নার জ্বালিয়ে ছোটখাট রাসায়নিক পরীক্ষা করা যায়। বালির নমুনা তুলে এনে এখানে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করি। টেস্ট-টিউবে বালির নমুনা রেখে তাতে বিভিন্ন রাসায়নিক তরল পদার্থ ঢেলে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করি, রঙ দেখি। এমনি করে বোঝার চেষ্টা করি কোন ধাতুর লক্ষণ ফুটে উঠছে কি না।

পর পর অনেকগুলো বালির নমুনা পরীক্ষা করি, কিন্তু ছিটেফোঁটা ধাতুরও কোন হদিশ মেলে না। হতাশ হবার মতই অবস্থা হয় আমাদের, কিন্তু হতাশ আমরা হই না, কারণ বিজ্ঞানীর হতাশ হতে নেই।

পাঁচ দিনে একশোটা বালির নমুনা পরীক্ষার সেঞ্চুরি যখন করতে বসেছি, তখন বিষেণলাল বললে, "আর এখানে কেন, অন্য কোথাও যাওয়া যাক।"

"না।" আমি দৃঢ়স্বরে বললাম, "এখানে আরও ভাল করে পরীক্ষা করতে হবে, আরও অন্ততঃ পক্ষে একশোটা বালির নমুনা তুলব আমি...."

বার বার একশোবার বিফল হয়েও নতুন উৎসাহে আমি বালি পরীক্ষা ও নমুনা তোলা শুরু করি। সেদিন যুগলকিশোরের হাবেলি থেকে অনেকটা দূরে এসে যখন বালি পরীক্ষা করতে শুরু করেছি তখন সূর্য মাথায় উঠেছে। প্রখর রোদে বালি ঝলমল করছে, তার দিকে তাকানোই যাচ্ছে না। এমন সময় একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। চোখ ধাঁধানো জৌলুসের মধ্যে একটি নিষ্প্রভ বৃত্ত দেখা দিল, চোখ ঝলসানো বালির কপালে যেন টিপ পরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তার কাছে গিয়ে দেখি, এখানে বালির রঙ বদলেছে, উজ্জ্বল সাদা রঙ ফ্যাকাসে বাদামি রঙে পরিণত হয়েছে। এই বাদামি রঙের বালির নমুনা তুলে নিয়ে একটা থলির মধ্যে ভরে ফেলি।

হাবেলিতে ফিরে এসে যুগলকিশোরকে প্রশ্ন করি, "বলতে পারেন দাদাজি, মদনমোহনের মূর্তিটি কোন ধাতু দিয়ে তৈরি ছিল?"

"পেতল।" যুগলকিশোর জবাব দিলেন, "ক্ষেত্রীর পেতল দিয়ে মূর্তিটা গড়িয়েছিলেন আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা।"

বালির নমুনাটিকে আমার পোর্টেব্‌ল্‌ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করি। তার মধ্যে তামা ও দস্তা দুটি ধাতুরই অস্তিত্বের আভাস পাই। তামার সঙ্গে দস্তা মিশিয়ে পিতল তৈরি হয়। নিঃসন্দেহে মদনমোহনের মূর্তি থেকে তামা ও দস্তা ক্ষয় হয়ে বেরিয়ে এসে বালির রঙকে বাহারী করে দিয়েছে।

"পেয়েছি।" যুগলকিশোরকে উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম, "মদনমোহনের মূর্তি কোথায় আছে তার সন্ধান পেয়েছি।"

"তাই নাকি!" রুদ্ধশ্বাসে বললেন যুগলকিশোর। তারপর বিষেণলাল ও আমার সঙ্গে এলেন তিনি সেই জায়গাটিতে, যেখানে বালির সাদা রঙে বাদামি ছোপ পড়েছে।

আমি বললাম, "এখানে খুঁড়লেই মদনমোহনকে পাওয়া যাবে।"

বাদামি রঙের বৃত্তটির দিকে এক দৃষ্টে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে যুগলকিশোর বললেন, "তোমরা ঠিক জান যে এখানে খুঁড়লেই মদনমোহনকে পাওয়া যাবে?"

"হ্যাঁ। এই বালির মধ্যে তামা ও দস্তা পেয়েছি, মদনমোহনের মূর্তিই তার উৎস। আমার ধারণা, মূর্তি থেকে ক্ষয় হয়ে তা বালিতে মিশে এই বাদামি রঙ সৃষ্টি করেছে। আপনি অনুমতি দিলে আজই এখানে খুঁড়তে শুরু করছি...."

"না না!" যুগলকিশোর শিউরে উঠে বললেন, "খুঁড়তে গেলে মদনমোহন আহত হবেন। তা ছাড়া আমার মনে হচ্ছে দুশো বছর ধরে যেখানে বিরাজ করছেন তিনি, সেখানেই থাকুন তিনি, তাতেই আমাদের মঙ্গল....তাঁকে তুলে আনার দরকার নেই...."

P-583, Dum Dum Park ; Calcutta-55.


কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (1956) 8 ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হল।

1. প্রকাশ স্থান: 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-9।
2. প্রকাশ কাল: মাসিক।
3. প্রকাশক ও মুদ্রাকর: রবীন বল, ভারতীয় নাগরিক।
4. সম্পাদক: রবীন বল।
5. যে সকল ব্যক্তি এই পত্রিকার মালিক এবং যাঁরা মোট মূলধনের এক শতাংশেরও অধিক অংশীদার বা শেয়ার গ্রহীতা তাঁদের নাম ও ঠিকানা।

(ক) মালিক: রবীন বল, 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-9

আমি রবীন বল এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

(স্বাঃ) রবীন বল, প্রকাশক, মার্চ, 1987

# জাতীয় বিজ্ঞান দিবসের অনুষ্ঠান

ভারত সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী 28শে ফেব্রুয়ারীর দিনটি প্রতি বছর জাতীয় বিজ্ঞান দিবসরূপে সারা দেশে পালন করা হবে। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের গত অধিবেশনে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই বছরেই, প্রথম এর মূল্য সারা দেশের মানুষের মনে সাড়া জাগিয়ে দিয়েছে। অধ্যাপক সি. ভি. রামনের বিশ্বখ্যাত আবিষ্কার রামন এফেক্ট 1928 সালের এই দিনটিতে ঘোষণা করা হয়েছিল। সুতরাং ঐ দিনটি ভারতীয় বিজ্ঞানের পটভূমিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয় পর্ষদ তাঁদের অধীনের সমস্ত বিজ্ঞান মিউজিয়াম ও বিজ্ঞান কেন্দ্রগুলিতে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে ছাত্রছাত্রী ও জনসাধারণের জন্যে নানা আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন! রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান সংগ্রহালয়ের পর্ষদের অধীন বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার পরিচালনায় এক বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা দেশপ্রিয় পার্ক থেকে সকাল 9টায় শুরু করে সংগ্রহশালায় পৌঁছয়। এই বিজ্ঞান পদযাত্রায় প্রায় 62 টি স্কুলের 4 হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও 101টি বিজ্ঞানীদের নানা রঙের পোস্টার ও স্লোগান নিয়ে পদযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। বিচিত্র রঙের হাইড্রোজেন গ্যাসেভরা রাশি রাশি বেলুন শোভাযাত্রাটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলে। এই বিজ্ঞান পদযাত্রার মুখ্যাগণে কলকাতার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী বুদ্ধিজীবী ও লেখক লেখিকা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী গবেষক এবং অধ্যাপক অংশ গ্রহণ করেন। তার মধ্যে বর্ষীয়ান পদার্থবিদ ডঃ শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়, ডঃ পার্থ ঘোষ অধ্যাপক ডি. কে. সিংহ, অধ্যাপক সুশীল কুমার মুখার্জি ডঃ জয়ন্ত বসু শ্রীদিলীপ কুমার রায় ডঃ সুজিত দত্ত ও শ্রী আর সুব্রমনিয়াম এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্র অনুরাগী ও সাহিত্যিক শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীও বিজ্ঞান পদযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। প্রায় 5 হাজার লোক এই পদযাত্রায় সামিল হন। এই পদযাত্রায় ভারতীয় বিজ্ঞানীদের ছবি, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শ্লোগান ও বিজ্ঞানীদের চিন্তা ভাবনার কথা প্রদর্শিত হয়েছিল। বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালায় এই শোভাযাত্রা পৌঁছবার পর একটি অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিজ্ঞানী সমবেত সকলকে এই দিনটির তাৎপর্য ও অধ্যাপক সি. ভি. রামনের অবিস্মরণীয় আবিষ্কারের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। বিজ্ঞান দিবসের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার ডিরেক্টর শ্রী সমর বাগচী। ডক্টর শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক সি. ভি. রামনের আবিষ্কার সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন এবং এ অনুষ্ঠানে অধ্যাপক সুশীল কুমার মুখার্জি সভাপতিত্ব করেন। অধ্যাপক সি ভি. রামনের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ডক্টর শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়। প্রদর্শনীতে অধ্যাপক রামনের ব্যক্তিগত জীবনও চিঠিপত্রের অনুলিপি ও তাঁর গবেষণা ও কর্মজীবনের এক সুস্পষ্ট ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া, সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠরত ও তার ঊর্ধ্বে পাঠরত স্কুলের প্রায় 257 জন ছাত্র-ছাত্রী বিজ্ঞান ক্যুইজে অংশ গ্রহণ করে। ভারতীয় বিজ্ঞানের উপর গুরুত্ব দিয়ে এই ধরনের ক্যুইজ অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহের সীমা ছিল না। প্রাইমারী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এক অভিনব 'বসে আঁকো' প্রতিযোগিতাও ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা 'সূর্যই সকল শক্তির উৎস' এই বিষয়ের উপর ভিত্তি করে সুন্দর ছবি এঁকেছিলেন। সর্বোপরি বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্রকৃতি ও জীবজন্তুকে যাতে আরও ভালবাসে এবং তাদের প্রতি যত্নবান হয়, সেই উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে বহু ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা

জাতীয় বিজ্ঞান দিবসে কলকাতার বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালা কর্তৃক আয়োজিত বিজ্ঞান পদযাত্রা—1987

তাদের আদরের পশু পাখী ও টবে-রাখা গাছপালা নিয়ে সকলকে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যটুকু প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে দেয়। আমাদের দেশে এই ধরনের অনুষ্ঠান এই প্রথম বলা যেতে পারে। 'কুমেরু অভিযান' ও 'বন্যপ্রাণী' বিষয়ক বিশেষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী দর্শকদের মুগ্ধ করে। চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হসপিটালের অস্ত্রোপচার বিভাগের ডাক্তার এ. বি চন্দ্র ক্যানসার রোগ সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন।

বিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের কাছে পৌছে দিতে কুসংস্কার ত্যাগ করতে হবে, দারিদ্র্য দূর করতে হবে ও বিজ্ঞানের সুযোগ সুবিধা সকল স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে এবং এর দ্বারাই দেশের অর্থনৈতিক ও সমাজ পরিবর্তন এবং উন্নতি সম্ভব। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন সারা দেশের মানুষের মধ্যে "বিজ্ঞান মনস্কতা" গড়ে তুলতে হবে।

বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গড়ে তোলা ও বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে।

## ভূমির ব্যবহার ও সমীক্ষা

গত 1লা মার্চ 1987 দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত দক্ষিণ দুর্গাপুর গাজিপুর, মৌজা নং 61-তে ভূমির ব্যবহার এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সমীক্ষার কাজে অংশ গ্রহণ করে কলকাতার ভগবতী বালিকা বিদ্যালয়, লী মেমোরিয়াল গার্লস হাইস্কুল এবং দক্ষিণ দুর্গাপুর কে. সি. হাইস্কুলের তিন শতাধিক ছাত্রছাত্রী। উক্ত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক শিক্ষিকাগণ সমীক্ষার কাজে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করেন। স্থানীয় অধিবাসীগণ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কলকাতার পার্ক ইনস্টিটিউশনের ভূগোল শিক্ষক শ্রী কালিদাস চন্দ।

## বিজ্ঞান অন্বেষার উদ্যোগে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালিত

গত 28শে ফেব্রুয়ারী শনিবার জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে বিজ্ঞান অন্বেষার উদ্যোগে গুসকারা পি. পি. ইন্সস্টিটিউশনে "দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব" শীর্ষক একটি বিজ্ঞান আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বভারতী পদার্থবিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক ডঃ দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বর্তমান বিশ্বে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কম্পিউটারের উন্নতির ফলে যে অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে তা সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থিত ছাত্র ও বিজ্ঞান শিক্ষকদের সামনে তুলে ধরেন।

## জাতীয় বিজ্ঞান দিবস

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল সায়েন্স সোসাইটীর উদ্যোগে গত 28 ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞান দিবস পালিত হয়। "বিজ্ঞানের বিবর্তন—বিবর্তনের বিজ্ঞান" শীর্ষক প্রদর্শনী ও প্রথম দিবসের "বিজ্ঞান আলোকে ভারতবর্ষ" শীর্ষক আলোচনা চক্র ছিল—অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান অঙ্গ।

## ফ্যারাও আমলের চিন্তা

### কপিঞ্জল শর্মা

গণেশের কৃপাপুষ্ট গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটলে ঘটা করে আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করার জন্য তাঁর সুযোগ্য পুত্ররা পুরোহিত সহ আমাকেও আমন্ত্রণ জানালেন।

একসময় পুরোহিত মশাই বিধান দিলেন, যেহেতু আত্মাকে দীর্ঘকাল প্রেতলোকে কাটাতে হয় তাই যাতে অসুবিধায় পড়তে না হয় তার জন্য দান করতে হয় ইহকালে যে সমস্ত জিনিস ব্যবহার করতো তার সবকিছুই। অন্ন-বস্ত্র, খাট-বিছানা, বাসন-কোসন, চেয়ার-টেবিল—মায় হাত মুখ ধোওয়ার সরঞ্জাম পর্যন্ত।

বিজ্ঞের ভঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করলাম—"গঙ্গাধরবাবু তো জীবদ্দশায় প্রাইভেট কার ছাড়া এক পাও চলতেন না। খাস চাকরও ছিল দু-জন। প্রেতলোকে গাড়ী, ড্রাইভার, চাকর ইত্যাদির জন্য অসুবিধা হবে না তাঁর ?"

মৃদু হেসে পুরোহিত মশাই বললেন—"শাস্ত্রে সে রকম ইঙ্গিতও আছে। তবে সবকিছু বলতে গেলে সবাই ভাববে পুরোহিত মেরে নেওয়ার তালে আছে।"

আমি গম্ভীর হলাম। মনে মনে ভাবলাম, পাঁচ হাজার বছর আগে মিশরের ফ্যারাওদের প্রেতলোক ছিল ভূগর্ভস্থ কবর। পাঁচ হাজার বছরের জ্ঞান বৃদ্ধির ফলে পুরোহিত মশাইরা কেমন করে নিজের ঘরকে যে প্রেতলোক বানালেন বুঝতেই পারলাম না।

## ভ্রম সংশোধন

মার্চ মাসে লিফ্‌ট গল্পের লেখকের নাম অশোক বসুর পরিবর্তে অমিয় দাশ পড়তে হবে।

[ 30 পৃষ্ঠার পরের অংশ ]

এরপর বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে যে দিকে আকৃষ্ট হতে থাকল তা হল পরমাণুকে ভেঙ্গে শক্তি বার করা এবং তার পরেও পরমাণুকে জুড়ে শক্তি বার করা। সামনেই রয়েছে আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত সমীকরণ

$E=MC^2$ E=এনার্জি বা শক্তি—আর্গ এককে
M=বস্তুর ভর, গ্রাম এককে
C=আলোর বেগই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে গতির সর্বোচ্চ সীমা প্রতি সেকেণ্ডে $3\times10^{10}$ সেণ্টিমিটার

আইনস্টাইন হিসাব কষে দেখালেন একগ্রাম পরিমাণ কোন মৌলপদার্থ যদি সম্পূর্ণভাবে আত্মবিলোপ বা নিশ্চিহ্ন করে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় তবে সেই শক্তির পরিমাণ হবে—$E=1\times(3\times10^{10})^2=9\times10^{20}$ আর্গ

অর্থাৎ $3\times10^7$ কিলোওয়াট আওয়ার।

তার অর্থ এক গ্রাম বিশুদ্ধ কয়লাকে সত্যি সত্যি নিশ্চিহ্ন করে নিয়ন্ত্রিত হারে শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়—তবে একগ্রাম কয়লা দিয়ে কলকাতা শহরকে বর্তমান হারে কুড়ি বছর ধরে অনায়াসে বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ করা যেতে পারে। কিন্তু যেহেতু এই আত্মবিলোপের গতি অতি ধীরে তাই যে কোন খণ্ডমুহূর্তে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু যদি কোন কৃত্রিম উপায়ে মুহূর্তে সময়ের মধ্যে কোন পদার্থ নিশ্চিহ্ন আত্মবিলোপ করে তবে তা থেকে প্রচণ্ড শক্তি পাওয়া যাবে।

ঠিক এই সময়ে 1932 সালে বার্লিনের টেকনিক্যাল আকাডেমীর উদ্বোধনী ভাষণে ফ্রীজ নটার ম্যান বললেন—"এই যে সেদিন কেমব্রিজে একটি ক্ষুদ্রতম বস্তু আবিষ্কৃত হল ( নিউট্রন ) এটাই সম্ভবতঃ সুপ্তপদার্থ থেকে বিপুল পরিমাণ শক্তি বের করে আনতে সক্ষম হবে।

আরও তিন বছর পর 1935 সালে বিখ্যাত কুরীদম্পতির কন্যা ও জামাতা আইরিন কুরী ও তার স্বামী জুলিয়েট কুরী স্টকহলমে নোবেল পুরস্কার আনতে গিয়ে বললেন, যে সব বৈজ্ঞানিক তাদের ইচ্ছামত কোন পরমাণুর বিলোপ ঘটিয়ে অন্য পরমাণুতে পরিবর্তিত করার ক্ষমতা রাখেন—তারা অবশ্যই বস্তুগুলির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিপুল পরিমাণ শক্তি আহরণ ও অবশ্যই করতে পারেন।

We are justified in reflecting that scientists who can construct and demolish elements at will may also be capable of causing nuclear transformations of an explosive character.......

এই সময় ইতালীয় বৈজ্ঞানিক রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক এনরিকো ফার্মি চ্যাডউইকের নব আবিষ্কৃত নিউট্রন দিয়ে সবচেয়ে ভারী পদার্থ ইউরেনিয়ামের পরমাণুতে আঘাত করে তাকে বিচূর্ণ করলেন। এটাই হল পরমাণু বোমা আবিষ্কারের চরমতম পরীক্ষা।

জিলার্ড এসব নিয়ে নিজে কোন পরীক্ষা না করলেও তিনি বুঝতে পারলেন সর্বনাশ হতে চলেছে। বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারের মাধ্যমে পরমাণু শক্তির হাতে ভবিষ্যত মানব সমাজের চরম লাঞ্ছনার কথা তিনি অন্য বৈজ্ঞানিকের কাছে জানিয়ে আবেদন করলেন তাঁরা যেন এ বিষয়ে আর বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ না করেন। কারণ তিনি 1933 সালে জার্মানীতে হিটলারের উত্থান হতে দেখেছেন। ভীত হয়ে সর্বপ্রথমে জার্মানী ছেড়ে চলে গেলেন অস্ট্রিয়াতে। তিনি একথাও বুঝেছিলেন হিটলারের হাত থেকে অস্ট্রিয়ারও রেহাই নাই—তাই সেখান থেকে চলে গেলেন ইংল্যাণ্ডে। সেখানেও জিলার্ড থাকলেন না—চলে গেলেন আমেরিকাতে। ফার্মি 1938 সালে নোবেল-পুরস্কার নিয়ে আর ফাসিস্ট ইটালীতে না ফিরে তিনিও চলে গেলেন আমেরিকাতে জিলার্ডের কাছে।

এই সময় সর্বজন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত বৈজ্ঞানিক—ডেনমার্কের নীলস্‌বোর 1939 সালে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন—অতি সামান্য পরিমাণ ইউরেনিয়াম 235 কে যদি ধীরে নিউট্রন দিয়ে তার পরমাণুতে আঘাত হানা যায় তবে বিস্ফোরণ হতে বাধ্য এবং সেই বিস্ফোরণ এই গবেষণাগার এবং তার সন্নিহিত চারপাশের শহর ধ্বংস করে দেবার মত যথেষ্ট শক্তিশালী।

জিলার্ড এইসব যত শুনছেন ততই তিনি বৈজ্ঞানিকদের কাছে দরবার শুরু করলেন। অনুরোধ জানালেন বাস্তব ক্ষেত্রে নিউট্রন দিয়ে পরমাণুর বক্ষ বিদীর্ণ করে সেই বিপুল শক্তি এখনও আহরিত হয়নি একথা ঠিক কিন্তু তা আর বেশি দূরেও নয়। আর এই চরম শক্তির কথা যদি কোন কারণে যুদ্ধ বিলাসী হিটলারদের কাছে গিয়ে পৌঁছয় তবে তা হবে মানব সভ্যতার পক্ষে পরম সঙ্কটতম দিন।

জুলিয়েট কুরীকে টেলিগ্রাম করলেন—উত্তর পেলেন—'বড্ড বেশি দেরী হয়ে গেছে'।

জিলার্ড নিজে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন ইউরেনিয়ামের পরমাণুকে বিদীর্ণ করে একটি নিউট্রন মুক্ত করা যাচ্ছে। এখন যদি ঐ ধাতুর পরিমাণ বেশি হয় যার ফলে একের পর এক নিউট্রন মুক্ত হবে—তাহলে চক্রবৃদ্ধি হারে বিক্রিয়া সৃষ্টি হবে অর্থাৎ চেন-রিয়্যাকশন শুরু হয়ে যাবে—ফল হবে অত্যন্ত এক শক্তিশালী বিস্ফোরণ। জিলার্ড ঠিক করলেন তার প্রথম কাজ হবে ইউরোপের ইউরেনিয়াম সম্ভার হিটলারের কাছ থেকে সরিয়ে নিরাপদ দূরত্বে এনে রাখা। কারণ সবচেয়ে বেশি ইউরেনিয়াম রাখা আছে বেলজিয়ামে—বেলজিয়াম-কঙ্গো থেকে সংগৃহীত করা।

আইনস্টাইন তখন স্থায়ীভাবে আমেরিকাতে বাস করছেন—হিটলার তাঁকে জার্মানী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। জিলার্ডের মনে হল তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বললে তিনি

হয়ত এর একটা সুরাহা করতে পারেন। আইনস্টাইন তখন থাকতেন প্রিন্সটনে। এই প্রিন্সটনেই থাকতো জিলার্ডের বন্ধু উইগনার। আইনস্টাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানালেন তিনি তাঁর গরমের ছুটিতে যাচ্ছেন লঙ আইল্যান্ডে বিশ্রামের জন্য—সেখানে তারা ইচ্ছে করলে দেখা করতে পারেন।

সুতরাং 1939-এর জুলাই মাসে লঙ আইল্যান্ডে গেলেন জিলার্ড আর উইগনার। আইনস্টাইন ওদের দুজনকে তার পড়ার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং যে সব কথা হয়েছিল জিলার্ডের জবানীতে তা হ'ল —আইনস্টাইনের ইউরেনিয়াম দিয়ে চেনরিয়্যাকশনের সম্ভাবনার কথা মনে হয়নি। কিন্তু বলামাত্র তিনি এর গুরুত্ব অনুভব করলেন এবং তিনি সাহায্য করতে প্রস্তুতও হলেন। সিদ্ধান্ত হল আমেরিকার সদর দপ্তরে একটা চিঠি লেখা হোক যাতে আমেরিকা যেন বেলজিয়াম সরকারের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করে ইউরেনিয়ামের মজুদ ভান্ডার সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন করতে অনুরোধ জানায় এবং দ্বিতীয়তঃ পরমাণু পরীক্ষা ত্বরান্বিত করার জন্যে যথোপযুক্ত অর্থ-আনুকূল্য পাওয়া যায়। সেই মর্মে চিঠি রচনা করা হল। যতদূর জানা যায় জিলার্ডই ছিলেন ঐ চিঠিখানির রচয়িতা। আইনস্টাইনও অবশ্য পরবর্তী কালে বলেছিলেন—চিঠিখানি তিনি সই করেছেন এবং সেই হিসাবে সব দায়িত্বও তাঁর, তবে চিঠিখানির রচয়িতা তিনি নন। অন্যদিকে জিলার্ড বলেছেন—আমার যতদূর মনে পড়ে আইনস্টাইন জার্মান ভাষায় ডিকটেশন দেন। টেলার সেটা শর্টহ্যান্ডে লিখে নেন। সেই বক্তব্য অবলম্বন করে আমি দুখানি চিঠি ইংরাজী ভাষায় লিখি—একখানি বড় এবং অন্যটি ছোট। দুখানাই প্রেসিডেন্টকে লেখা। আইনস্টাইন বড়টি পছন্দ করেন। আমি শুধু আইনস্টাইনের চিঠির সঙ্গে একটা মেমোরেন্ডাম লিখে যুক্ত করে দিই।

জিলার্ড ঐ চিঠি নিয়ে 1939-এর 2রা আগস্ট লঙ আইল্যান্ডে গিয়ে আইনস্টাইনের সই করিয়ে আনলেন।

জিলার্ডের অবশ্য ভাবনা ছিল কিভাবে চিঠির বক্তব্য আমেরিকান প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত নজরে আনা যায়। সেজন্যে তিনি অনেকের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। তখন আলেকজান্ডার স্যাক্‌স নামে এক বিদগ্ধ ধনীর সঙ্গে জিলার্ডের পরিচয় হল। স্যাক্‌স অবশ্য কোন সরকারী পদকর্তা ছিলেন না—তবে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ছিলেন তার পরিচিত জন এবং সেই সুবাদে স্যাকসের হোয়াইট হাউসে যাতায়াত ছিল। ঠিক হল স্যাক্‌স চিঠিখানি স্বয়ং প্রেসিডেন্টের হাতে দিয়ে আসবেন। সেই অনুযায়ী ডাঃ স্যাক্‌স 1939 সালের 11ই অক্টোবর তারিখে—জিলার্ডের রচনা করা এবং আইনস্টাইনের সই করা চিঠি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে নিয়ে পৌঁছলেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে ইউরেনিয়াম নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের এত মথাব্যথা—হৈচৈ সে সম্পর্কে তদানীন্তন বৃহৎ রাষ্ট্রের নায়কেরা মোটেই সচেতন ছিলেন না। আমেরিকার সদর দপ্তর তো জানতেন না যুদ্ধে এর কোন প্রয়োজন আছে কিনা। অন্যদিকে জার্মানীর সমর দপ্তর এগুলি সংগৃহীত করে রেখে দিয়েছেন এক শক্ত ধরনের সঙ্কর ধাতু তৈরি করার জন্যে।

যাই হোক ডাঃ স্যাক্‌স প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণের জন্য চিঠিটি প্রেসিডেন্টের সামনে জোরে পড়তে লাগলেন।

চিঠির দীর্ঘ বক্তব্যে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট বিশেষ খুশী হচ্ছিলেন না। কিন্তু আইনস্টাইনের মত একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে অসম্মান করা হবে বলেই মাঝপথে স্যাক্‌সকে থামিয়েও দিতে পারছিলেন না। চিঠিখানি শেষ হলে হেসে বললেন—ভেরি ইন্টারেস্টিং (very interesting) আবার বললেন কিন্তু সরকারের তরফ থেকে এ বিষয়ে এত তাড়াতাড়ি কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া সঙ্গত হবে না। স্যাক্‌সও ঠিক এই ভয়টাই করেছিলেন। তাই হতাশ হয়ে ফিরবার আগে স্যাক্‌স প্রেসিডেন্টের কাছে পরের দিন আবার কথা বলার জন্যে সময় প্রার্থনা করলেন। স্যাকস বেশ বুঝতে পারলেন তাকে শুধুমাত্র সান্ত্বনা দেবার জন্যেই প্রেসিডেন্ট তার প্রাতঃরাশের সময় স্যাক্‌সকে পরদিন আবার সময় দিলেন। স্যাক্‌স হোটেলে ফিরে বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে পরদিন সকালে রুজভেল্ট যখন একাকী তার খাবার টেবিলের হুইল চেয়ারে বসেছিলেন তখন তার খাবার ঘরে প্রবেশ করলেন। স্যাক্‌সকে দেখামাত্র প্রেসিডেন্ট ঠাট্টা করে বলেছিলেন—বলুন! আবার কি নতুন সমাচার এনেছেন? কত সময় লাগবে আপনার?

স্যাক্‌স বললেন—বেশিক্ষণ নয়। তবে এবার আর কোন চিঠি নয়—আমি আজ আপনাকে একটা গল্প বলতে চাই। তিনি বলেছিলেন ফরাসী সম্রাট নেপোলিওনের কথা। ট্রাফলগার যুদ্ধের ঠিক আগের কথা। গোটা ইউরোপ তখন নেপোলিওনের দখলে, বাকী শুধু ইংল্যান্ড। নেপোলিওন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ইংল্যান্ড আক্রমণের ব্যবস্থায় ব্যস্ত। এমন সময় একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক এসে নেপোলিওনের দর্শনপ্রার্থী হলেন। বহু চেষ্টায় নেপোলিওনের সঙ্গে দেখা করে জানালেন—তিনি এক ধরনের বাষ্পচালিত জাহাজ তৈরি করতে সক্ষম—যাতে পাল খাটানোর প্রয়োজন হয় না। সুতরাং এই জাহাজগুলি খারাপ আবহাওয়াতেও সুন্দর কাজ করতে সক্ষম।

নেপোলিওন অবিশ্বাসী স্বরে বলেছিলেন—পাল ছাড়া জাহাজ? ভেরী ইন্টারেস্টিং (very interesting)!

বৃটিশ ঐতিহাসিক লর্ড এ্যকটন—ইংল্যান্ড সেদিন কি ভাবে নেপোলিওনের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল বলতে

গিয়ে লিখেছেন নেপোলিওন যদি সেদিন একটু দূর-দর্শিতার পরিচয় দিতেন—ঐ বৈজ্ঞানিকের মতবাদকে একটু সম্মান জানাতেন তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ইতিহাস অন্যরকম হতো।

স্যাকসের এইসব কথা শুনে প্রেসিডেণ্ট নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। তারপর কাগজে কি একটা লিখে আর্দালীর হাতে দিলেন। লোকটা ভেতরে গিয়ে একটা মদের বোতল নিয়ে ফিরে এলো—নেপোলিওনের সময়ের ফরাসী মদ—প্রেসিডেণ্টের দীর্ঘ-দিনের রক্ষিত পারিবারিক সম্পত্তি। প্রেসিডেণ্ট নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছেন—ইঙ্গিতে লোকটিকে দুটি গ্লাসে ঐ মদ দিতে বললেন। একটি ডাঃ স্যাকসের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে—অন্যটি নিজে তুলে নিলেন এবং স্যাকসের দিকে মাথা নেড়ে পান করলেন। তারপর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে স্যাকসের দিকে চেয়ে বললেন এ্যালেক্স—তুমি কি এই কথাই বলতে চাও যে নাৎসীরা যেন আমাদের পরমাণু বোমায় উড়িয়ে না দেয়?

স্যাকস বললেন—ঠিক তাই।

এবার প্রেসিডেণ্ট নড়ে চড়ে উঠলেন এবং ডেকে পাঠালেন তার মিলিটারী এ্যাটাচি জেনারেল পা ওয়াট-সনকে। পা ঘরে এলে প্রেসিডেণ্ট স্যাকসের আনা আইনস্টাইনের চিঠির কাগজগুলি মিলিটারী এ্যাটাচির দিকে বাড়িয়ে ধরে সেই বিখ্যাত উক্তিটি করেছিলেন—পা দিস্ রিকোয়ার্স এ্যাকশন (Pa this requires action)।

আইনস্টাইনের ঐ চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্রের টনক নড়লো। তারপর যা আরম্ভ হল তা অবিশ্বাস্য। দেশের সবচেয়ে মাথাওয়ালা বিজ্ঞানী ও কারিগরদের একত্র করে প্রায় দুশো কোটি টাকা খরচ করে লস্এলমস্ নামে মেক্সিকোর এক নির্জন জায়গায় গড়ে তোলা হল এক বিচিত্র ও বিরাট গবেষণাকেন্দ্র—ম্যানহাট্টান প্রোজেক্ট।

প্রথম পর্যায়ে তিনটি বোমা তৈরি হয়েছিল।

প্রথমটি পরীক্ষা করা হয়—লস্ এলমসের কাছে এক মরুভূমিতে 1945 সালের 16 জুলাই ভোর 5টা 30 মিনিটের সময়।

বিস্ফোরণের ভয়াবহতা দেখে ম্যানহাট্টান প্রোজেক্টের অন্যতম কর্ণধার ওপেনহাইমার ঘটনাস্থলেই গীতা থেকে শ্লোক উচ্চারণ করে তার মনের ভাব ব্যক্ত করেছিলেন—

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো॥

আরও উচ্চারণ করেছিলেন—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্তুমিহ প্রবৃত্তঃ

অন্যদিকে যুদ্ধবিদ্ জেনারেল ফ্যারেল বলেছিলেন—

The whole country was lighted up with an intensity many times that of midday sun.... Thirty seconds after the explosion came, first, the airblast pressing hard against the people and things, to be followed almost immediately by the strong, sustained, awesome roar which warned of doomsday and made us feel that we huny things were blashemous to dare tam-per with the forces heretofore reserved to the Almighty. Words are inadequate tools for the job of acquainting those not present with the physical, mental, and psychological effects. It has to be witnessed to be realized. প্রতিভাত হল—সহস্র মধ্যাহ্ন সূর্যের ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত উন্মত্ত এক অগ্নি গোলক; মুহূর্তের মধ্যে এলো প্রচণ্ড বায়ুর ঝটিকা প্রবাহ এবং তার পরই এসেছিল ক্রুদ্ধ ভয়াবহ গর্জন যেন অসীম মহাশক্তির নিজস্ব অধিকারের মধ্যে হীন মনুষ্যকুলের অবাঞ্ছিত প্রবেশ স্পর্ধার ইচ্ছায় সেই মহাশক্তির ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি ও গর্জনে সমগ্র মানবকুলের শেষ বিচারের দিনের ঘণ্টা ধ্বনি বেজে উঠলো।

বাকী দুটি পরীক্ষিত হয়েছিল জাপানে, 6ই আগস্ট হিরোসিমাতে এবং 9ই আগস্ট নাগাসিসিতে। দুটি জনপদ মুছে গিয়েছিলো মানব সভ্যতার ম্যাপ থেকে।

একটি ছোট সাইজের পরমাণু বোমার ক্ষতিকারক ক্ষমতা প্রায় বিশ হাজার টন ডিনামাইটের সমান—উত্তাপ সৃষ্টি হয় প্রায় এক কোটি সেণ্টিগ্রেডের কাছাকাছি এবং পঞ্চাশ ষাট মাইল ব্যাস জুড়ে এর তাণ্ডব ধ্বংস লীলা। এ ছাড়া পরমাণু বোমা ফাটার দরুন তেজস্ক্রিয়তার প্রভাবে জীবিত প্রাণিকুলের তিলে তিলে মৃত্যু। বড় কষ্টকর ও শোচনীয় সেই মৃত্যু।

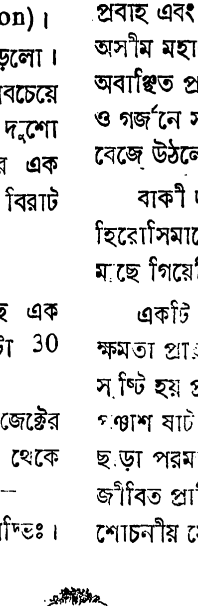

# আগুনের কথা

## সাধন কুমার গিরি

টুকুনকে চেনো তোমরা? ভীষণ খেয়ালী। যত সব উদ্ভট চিন্তা ওর মাথায়।

সেদিন সন্ধ্যা থেকেই লোড-শেডিং। অথচ পরীক্ষা এসে যাচ্ছে—পড়াশুনা না করলেই নয়। মা একটা মোমবাতি জেলে দিয়ে গেলেন টুকুনের পড়াশুনা করবার জন্য। ঘণ্টা দুয়েক লোড-শেডিং-এর পর ইলেকট্রিসিটি ফিরে এল। লাইটটা জেলে দিয়ে মা মোমবাতি ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলেন। এর মধ্যে আর অবাক হবার কি আছে বল? কিন্তু টুকুন গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসল, ফুঁ দিলে মোমবাতির শিখা নিভে যায় কেন?

আর একদিনের কথা বলি। খবরের কাগজ জুড়ে লেখা শুধু জ্বালানী সমস্যার কথা—পেট্রল পাওয়া যাচ্ছে না, ডিজেলের অভাব, কেরোসিনের দাম বাড়ছে—এই সব। টুকুন ভাবে, জলের তো অভাব নেই—জলকে যদি জ্বালানো যেত, তবে কী মজার না হোত! কিন্তু জলে আগুন লাগে না কেন? ওর বন্ধু পিকু একথা শুনে বলল, "ব্যারে, জল যে সব কিছু ভিজিয়ে দেয়, আগুন ধরবে কি করে? দেখনি, দমকলের লোকেরা জল ঢেলে আগুন নেভায়'। টুকুন কিন্তু এতে খুশী হয় না। ও বলে 'সে কি! কেরোসিন সব কিছুকে ভিজিয়ে দেয়, কিন্তু সে তো আগুন ছোঁয়ানো মাত্র জ্বলে ওঠে।'

তোমাদের মধ্যে যারা বড়, তারা হয়ত টুকুনের রকমসকম দেখে ভাবছ, ও একটা বোকা। কিন্তু সত্যি করে বলতো, টুকুনের প্রশ্নের মনের মত উত্তর কি তোমরাই দিতে পারবে?

দেশলাই কাঠি কেন জ্বলে বলো তো? কাঠিটাকে বাক্সের গায়ে ঘষলে কাঠির মাথাটা গরম হয়ে যায়। আর তখনই আগুন জ্বলে। তাহলেই বোঝ, ফুঁ দিয়ে মোমবাতির সলতেটাকে ঠাণ্ডা করতে পারলে, মোমবাতির আগুন যাবে নিভে। অনেক, অনেক দিন আগে যখন মানুষ দেশালাই বানাতে শেখেনি, তখন দুটো পাথর ঠোকাঠুকি করে আগুন জ্বালানো হত। ঠোকাঠুকির ফলে পাথর দুটি গরম হয়ে যেত, আর বেরুত আগুন। এই আগুনকে জিইয়ে রাখার জন্য দরকার দুটো জিনিসের—এক হল জালানী আর এক হল অক্সিজেন গ্যাস / জ্বালানী আমরা তাকেই বলে থাকি যে আগুনকে জ্বলে থাকতে সাহায্য করে। পেট্রল, কেরোসিন, ডিজেল, কাঠ এরা সবাই আগুনকে জ্বলে থাকতে সাহায্য করে—এরা জ্বালানী। দেশলাই কাঠি জ্বালালে সেটা কিছুক্ষণ জ্বালানোর কারণ দেশলাইর কাঠিটা তৈরি হয়েছে কাঠ দিয়ে, অথবা মোম-মাখানো কাগজ দিয়ে। কাঠ বা মোমবাতি পুড়লে তৈরি হয় জল আর কার্বন। এই কার্বনটার কিছু অংশ আবার আগুনে পুড়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড নামক এক রকম গ্যাস তৈরি করে। মোমবাতি জেলে তার শিখার উপর একটা বাসন ধরে রাখ—দেখবে তার উপর কালো কার্বন জমে রয়েছে। যে কাজল তোমরা চোখে দাও, যে ঝুল তোমাদের ঘরগুলো নোংরা করে রাখে—এরা কার্বনের ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ কি? সেটা হল যে, মোম বা কাঠ পুড়লে জল তৈরি হয়। জল কিন্তু আগুনকে জ্বলতে সাহায্য করে না। কি করে করবে বল?—জল যে তৈরি হয় অন্য দুটো জিনিসকে মিশিয়ে। এই জিনিস দুটো হল—অক্সিজেন গ্যাস এবং হাইড্রোজেন গ্যাস। ছাইকে কি জ্বালানো যায়? জলও যে এক রকমের ছাই। তাই তাকে জ্বালানো যায় না।

এ তো গেল আগুন জ্বালাবার কথা। এবার আগুনকে কি করে নেভানো যায়, দেখা যাক।

আমরা তো বলেছি, কোন কিছু জ্বালাবার জন্য দরকার অক্সিজেন গ্যাসের। বাতাসে প্রতি 100 ভাগের মধ্যে 20 ভাগই অক্সিজেন গ্যাস। তাই যথেষ্ট বাতাস পেলে, জ্বলতে কোন অসুবিধা নেই। ফুঁ দিলে মোমবাতির সলতেটাকে নেভানো যেতে পারে। আরও একভাবে কিন্তু মোমবাতিটাকে নেভানো যেতে পারে। মোমবাতির সলতেটাকে একটা মোটা কাপড় দিয়ে চাপ দাও। অথবা, একটা বড় কাঁচের গ্লাসকে উল্টে মোমবাতিটাকে ঢেকে দাও। জ্বলবার জন্য বাতাসের অক্সিজেন দরকার—সেটা না পেয়ে মোমবাতি নিভে যাবে। তাই, যখন জ্বলন্ত জিনিসের উপর জল ঢালা হয়, তখন সরাসরি বাতাস না পাবার দরুন আগুন নিভে যায়।

বড় বড় অফিসে গেলে দেখতে পাবে বন্ধ ছাতার মত এক ধরনের লাল রঙের জিনিস আছে প্রতি ঘরে। এটাকে বলা হয়—Fire extinguisher, মানে আগুন নেভাবার যন্ত্র। এই যন্ত্রের হাতলটা টানলেই ভেতর থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বেরোয়। এই গ্যাস নিজে জ্বলে না—তাছাড়া, বাতাসের চাইতে অনেক ভারী। তাই যন্ত্র থেকে এই গ্যাস মেঝের উপর একটা চাদরের মত বিছিয়ে পড়ে। মেঝেতে কোন জিনিস জ্বলতে থাকলে তার সাধ্য কি যে এই চাদরের মধ্য দিয়ে বাতাসের অক্সিজেন টেনে নেয়? ফলে আগুন নিভে যায়।

# দি ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ডস

বাণীরূপ - অনিল কর্মকার
চিত্ররূপ - গৌতম কর্মকার

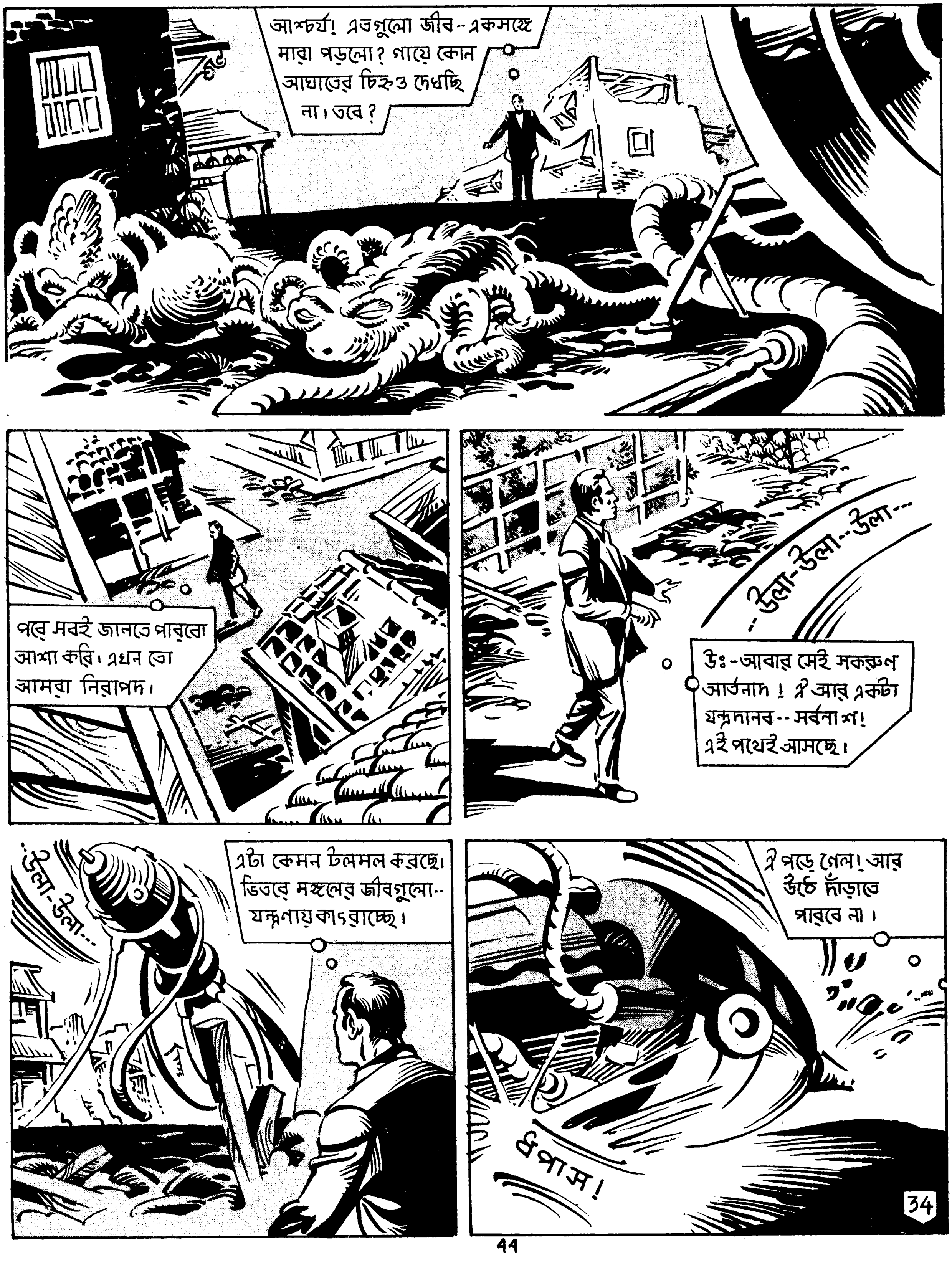
আশ্চর্য! এতগুলো জীব--একসঙ্গে মারা পড়লো? গায়ে কোন আঘাতের চিহ্নও দেখছি না। তবে?
পরে সবই জানতে পারবো আশা করি। এখন তো আমরা নিরাপদ।
--উলা-উলা--উলা--উলা---
উঃ-আবার সেই সকরুণ আর্তনাদ! ঐ আর একটা যন্ত্রদানব--সর্বনাশ! এই পথেই আসছে।
উলা-উলা...
এটা কেমন টলমল করছে। ভিতরে মঙ্গলের জীবগুলো--যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে।
ঐ পড়ে গেল! আর উঠে দাঁড়াতে পারবে না।
ধপাস!
34

উঃ, কী উৎকট গন্ধ! মঙ্গলের জীবগুলো মরে পচে গিয়েছে কয়েকটা।
বাকী ক'টাও শেষ। আর আক্রমণ করতে পারবে না।
উঃ, কী ভাবনাটাই না শেষ হোল! আবার নতুন করে সব গড়া হবে। লন্ডন আবার কোলাহলমুখর হয়ে উঠবে।
এবার মামাবাড়ীর দিকে নিশ্চিন্তে আমি যেতে পারি। আর ভয়ের কিছু নেই।
ঐ তো সব মানুষ-জন ফিরে আসছে! এবার সকলেই আমরা নিরাপদ।
35

মামাবাড়ীর পথে---
এদিককার বাড়ীঘর তো দেখছি অক্ষতই রয়েছে।
মঙ্গলবাসীরা তাহলে এই পথে আসেনি।
হে ঈশ্বর! সব যেন ঠিক থাকে প্রভু।
..ঠক..ঠক..
কে?
ওহ, তুমি? বেঁচে আছো এখনো!
ওহ, কী ভাবনাই যে হচ্ছিল!
আমি তো খুব ভেঙে পড়েছিলাম।
আমিও। যাক, সব ভয়ের শেষ হোল এবার।
কয়েক দিন পর--
আহ, এইতো--উত্তর মিলে গেছে।--
"জীবাণুকূলের অবিশ্বাস্য কীর্তি। জীবাণুহীন গ্রহ মঙ্গলের বাসিন্দারা এদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেনি। তাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে সবাই। আর আমাদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই।..."
Britania Times
Reestablishment of mankind

**ভাষান্তরঃ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়**

সূর্যের আলোয় ঝুলিয়ে রাখা শুষ্ক মৃতদেহগুলো যেন ওদের দিকে তেড়ে আসতে শুরু করেছিল। প্রচণ্ড তাপে মাংসগুলো যেন কাঁপন জাগিয়ে সবুজ জঙ্গলের লালচে আভাকেও নিষ্প্রভ করতে চাইছিল। পচন ধরা মাংসের তীব্র একটা গন্ধ জানালা দিয়ে ভেসে আসতেই লিওনোরা ওয়েব তাড়াতাড়ি গাড়ির জানালার কাচ তোলার জন্য বোতাম টিপল।

'ওঃ ভগবান,' ও বলে উঠল, 'খোলামেলা কসাইয়ের দোকান দেখলে কি বিশ্রী লাগে।'

গন্ধটা ততক্ষণে সারা গাড়িতেই ছড়িয়ে গেছিল। গন্ধটা যেন যুদ্ধের সেই ভয়ঙ্কর দিনের কথাটাই মনে করাতে চায়।

'মাছিগুলো লক্ষ্য করেছ ?' লিওনোরা আবার প্রশ্ন করল।

'এই সব বাজারে মাংস কিনতে গেলে থাপ্পর মেরে মাছিগুলো দুর করে তবেই মাংস দেখা যায়,' জন ওয়েব উত্তর দিল।

সবুজে ঘেরা জঙ্গলের বাঁকে গাড়ি ঘোরাল ওয়েব।

'তোমার কি মনে হয় ওরা আমাদের জুয়াটালায় ঢুকতে দেবে ?'

'জানি না।'

'সামনে লক্ষ্য কর।'

রাস্তায় পড়ে থাকা চকচকে জিনিসটা দেখতে একটু দেরীই হয়ে গেল ওয়েবের, কোন রকমে ব্রেক কষতে গিয়ে শব্দ তুলেই গাড়িটা থেমে গেল। দরজা খুলেই নেমে পড়ল জন ওয়েব। জঙ্গল যেন উত্তাপে টগবগ করে ফুটছিল, দুপুর বলেই রাস্তা সম্পূর্ণ জনশূন্য।

ওয়েব গাড়ির সামনের দিকে এগিয়ে নিচু হয়ে পরীক্ষা করতে চাইল। ওর হাত কোমরে ঝোলানো পিস্তলটা স্পর্শ করতে ভুলল না।

জানালার কাচ সমান লিওনোরা ওয়েব। 'চাকায় খুব বেশি চোট লেগেছে ?'

'একদম শেষ, খতম।' একটা ইস্পাতের মত চকচকে জিনিস তুলে দেখাল জন ওয়েব। 'একটা ভোজালি। চাকাটা একদম শেষ! ভাগ্য ভাল সব কটা চাকা যায়নি।'

'কিন্তু কেন ?'

'সেটা আমার মত তোমারও জানা থাকা উচিত।' লিও-নোরার পাশে পড়ে থাকা খবরের কাগজটার তারিখ আর হেডলাইন ইঙ্গিত করল ওয়েব। ওতে লেখা ছিল ;

"4ঠা অক্টোবর 1997ঃ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ নিশ্চুপ।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র আর ইউরোপ সম্পূর্ণ মৃত। চার দিকে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতা। যুদ্ধ চিরদিনের মতই শেষ।

একথা বিশ্বাস করার কারণ বর্তমান যে আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্রের সমস্ত অধিবাসীই মৃত। এটাও বিশ্বাসযোগ্য যে সমস্ত ইউরোপ, রাশিয়া আর সাইবেরিয়ার সমস্ত মানুষও মৃত। পৃথিবীর বুক থেকে সাদা মানুষদের দিন চিরকালের মতই শেষ।"

'সবই যেন কেমন দ্রুত ঘটে গেল', ওয়েব বলল। 'আমরা অন্য একটা জায়গায় বেড়াচ্ছিলাম, চমৎকার কাটছিল ছুটির দিনগুলো। তারপরের সপ্তাহেই এই ব্যাপার—।'

খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে ওরা দুজনেই জঙ্গলের দিকে তাকাল।

জঙ্গলটাও যেন বিরাটত্ব নিয়ে গভীর নীরবতায় ওদের দিকে তাকাল।

'সাবধান, জ্যাক।'

ওয়েব দুটো বোতাম টিপল। পরক্ষণেই সামনের চাকাটা উঁচু হয়ে হিস হিস করে উঠল। একটু পরেই চাকাটা খুলে বেরিয়ে এল। ওয়েব কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বাড়তি চাকাটা লাগিয়ে ফেলল। সারাক্ষণ পিস্তল হাতে রেখেছিল ওয়েব।

'খোলা জায়গায় বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকো না, জ্যাক।'

'তাহলে শুরু হয়ে গেছে', ওয়েবের মনে হল ওর মাথা তাপে ফেটে যেতে চাইছে। 'খবর বেশ দ্রুতই ছড়ায়।'

'আস্তে!' লিওনোরা বলে উঠল। 'ওরা শুনতে পাবে।' জঙ্গল ইঙ্গিত করল লিওনোরা।

ওয়েবও জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল,' 'আমি জানি তোমরা ওখানে আছ।'

'জ্যাক!'

ওয়েব জঙ্গল লক্ষ্য করে পিস্তল তুলল। 'তোমাদের দেখতে পেয়েছি।' দ্রুত এক এক করে পাঁচবার গুলি বর্ষণ করল ও পাগলের মত।

জঙ্গলের মধ্যে একটা প্রতিধ্বনি জেগে উঠে সবুজ ঘন ঝোপের মধ্যেই যেন বিলীনও হয়ে গেল। তার পরেই নেমে এল অপরিসীম নিস্তব্ধতা। পায়ে পায়ে গাড়ির মধ্যে উঠে দরজা বন্ধ করল ওয়েব।

আবার পিস্তলে গুলি ভরে নিল ও। তারপরেই গাড়ি চালু করে ওরা এগিয়ে চলতে লাগল।

অনেকক্ষণ সমান গতিতেই ওরা চলেছিল। আচমকা কিছু গাড়ির সামনের কাচে আঘাত করল।

'তুমি বড্ড জোরে চালাচ্ছ, ওয়েব। একটু আস্তে চল। বৃষ্টি হচ্ছে কি?'

'না, বৃষ্টি নয়। একটা পোকা।'

'পোকা?'

'হ্যাঁ। শিগ্‌গির জানালা বন্ধ করে দাও।' কথাটা বলেই বোতাম টিপল ওয়েব, সঙ্গে সঙ্গে জানালা বন্ধ হয়ে গেল।

ওয়েব ততক্ষণ ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে গাড়ি চালাচ্ছিল।

'আবার কোথাও আটকে গেলেই আমরা শেষ।'

'এগুলো স্থানীয় জিনিস। আমরা ঠিক বাধা পার হব' ওয়েব উত্তর দিল।

'কিন্তু', লিওনোরা বলল। 'ওরা তো আমাদের চেনে না।'

'চিনলেই ভাল হত', হুইল চেপে ধরল ওয়েব। 'চেনা লোকদের হত্যা করা কঠিন। অচেনা মানুষকেই মারা সহজ।'

'আমি মরতে চাই না', লিওনোরা বলে উঠল।

ওয়েব ওর কোটের ভিতরের পকেট ইঙ্গিত করল। 'আমার কিছু হয়ে গেলে, ঈশ্বরের দোহাই এটা ব্যবহার কোরো, সময় নষ্ট করতে যেও না!'

জন ওয়েব এবার সত্তর মাইল গতিতেই গাড়ি চালাল।

'রাস্তার মাঝখানে ভোজালি গেঁথে রাখা বা ব্লো-পাইপ ছুঁড়ে মারতে চাওয়া জঘন্য কাজ। ওরা কি করে জানতে পারে ওই রাস্তায় একটা গাড়ি আসবে আর তাতে সাদা চামড়ার বোর্ড থাকবে?' লিওনোরা প্রশ্ন করল।

'ওদের নীতিকথা শোনাতে যেও না। গাড়ি হল গাড়ি। গাড়ির অনেক দাম। গাড়ি বিক্রি করে যে টাকা ওরা পাবে তাতে সারা জীবন ওদের চলে যাবে। কোন রাস্তা আটকাতে পারলে কোন ধনী আমেরিকান স্পেনীয়কে পাওয়া গেলেও যেতে পারে।

'কটা বেজেছে?', লিওনোরা জানতে চাইল।

'এখন দুপুর।'

দুপুর। সীমান্ত সামনেই। সীমান্ত লক্ষ্য করেই ওদের দুজনের মুখে হাসি ফুটে উঠল....।

গাড়ি থেকে মুখ বের করে সীমান্ত স্টেশনের রক্ষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল জন ওয়েব। এবার ও গাড়ি থেকে নেমে বেঁটেখাটো তিনজন কোঁচকানো পোশাক পরা রক্ষীর দিকেই এগোল। রক্ষীরা ওকে অগ্রাহ্য করেই নিজেরা কথা বলে চলল।

'মাপ করবেন', জন ওয়েব বলল। 'আমরা সীমান্ত পার হয়ে জুয়াটালায় যেতে পারি?'

একজন রক্ষী ঘুরে তাকাল,' 'দুঃখিত, সেনর।'

'কিন্তু....আমাদের যে যেতেই হবে।'

মাথা নাড়ল রক্ষী। 'অসম্ভব। পাশপোর্টের কোন দাম নেই এখানে। আমাদের এ দেশ ছেড়ে যেতে চাইছেন কেন?'

'রেডিওয় ঘোষণা করা হয়েছে সব আমেরিকানকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যেতে হবে।'

'ওহ্। তাই বুঝি?' রক্ষীরা হেসে উঠল।

'না গেলে জেল আর জরিমানা হবে', ওয়েব বলল।

'আপনাদের সীমান্ত পার করে দিতে পারতাম, কিন্তু জুয়াটালাতেও চব্বিশ ঘণ্টার বেশি থাকতে দেবে না। বিশ্বাস না হয় শুনুন! 'এই যে, শুনতে পাচ্ছো?'

প্রায় চল্লিশ গজ তফাতে রাইফেল হাতে রোদ্দুরে পায়চারী রত একজন ওদের দিকে তাকাল।

'এই, প্যাকো, এই দুজন লোককে চাও নাকি?'

'ঈশ্বরের দোহাই, না', লোকটা হেসে বলল।

'তাহলে, ব্যাপারটা দেখলেন তো!' সব রক্ষীই হো হো করে হেসে উঠল।

'আমার টাকা আছে', ওয়েব বলল।

লোকগুলোর হাসি বন্ধ হয়ে গেল।

একজন কঠিন মুখে ওয়েবের সামনে এগিয়ে এল।

'হ্যাঁ', সে বলল। 'আপনাদের টাকা আছে, জানি।

আপনারা আসেন আর ভাবেন টাকায় সবই করা যায়। কিন্তু টাকা কি ? শুধু কিছু নিজক শপথ মাত্র, সেনর। বই পড়ে এটা জেনেছি। কেউ যদি আপনাদের ওই শপথের তোয়াক্কা না করে তাহলে ?'

'আপনারা যা চাইবেন তাই দেব।'

'দেবেন বুঝি ?' রক্ষী সঙ্গীদের দিকে তাকাল এবার। 'ওহে উনি যা চাই তাই দেবেন বলছেন।' সে আবার ওয়েবের দিকে তাকাল। 'আমরা আপনাদের কাছে তামাশার জিনিস, তাই না ?'

'না—!'

'আপনি আমাদের ঠাট্টা করেছেন, সেনর তাই না ?'

'না, আমি তা করিনি, হয়তো আগে কেউ করেছে।'

'না, আপনিই করেছিলেন।'

'কিন্তু....কিন্তু এখানে আমরা তো কখনও আসিনি।'

'হয়তো আপনি নন। কিন্তু তাতে কি এসে যায় ? সে আপনারই মত একজন।'

ওরা উন্মুক্ত রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইল। ঘামে ভিজে উঠেছিল সকলেরই শরীর। সৈন্যটি ওয়েবের কাছে এগিয়ে এল। 'আপনার জন্য আমাদের কিছুই করার নেই। আপনি কাঁপছেন, সেনর ?'

'না, না, আমি ঠিক আছি।'

'আপনার কত টাকা আছে ?' রক্ষী এবার প্রশ্ন করল।

'আমাদের যেতে দিলে এক হাজার পেসো আর ওই লোকটার জন্যও এক হাজার পেসো দেব।'

'কিহে এক হাজার পেসোয় চলবে ?'

'না', অন্য রক্ষী উত্তর দিল। 'আমাদের নামে রিপোর্ট করতে বল।' রক্ষী আবার ওয়েবের দিকে ফিরল। 'যান, রিপোর্ট করুন গিয়ে। আমার চাকরি খেতে পারেন কিনা দেখুন। অনেক কাল আগে একবার আপনিই আমার চাকরি খেয়েছিলেন।'

'সে অন্য কেউ।'

'যান, আমার নাম করবেন। আমার নাম কার্লোস রডরিগেজ যশ্‌ল। যান, এগোন।'

'বুঝেছি।'

'না, কিছুই বোঝেন নি', কার্লোস রডরিগেজ যশ্‌ল বলল। 'দিন, দুহাজার পেসো ছাড়ুন।'

জন ওয়েব ব্যাগ থেকে দুহাজার পেসো বের করে দিতেই কার্লোস ঘর্মাক্ত হাতে সেটা গুণে পকেটে পুরল। তারপর বলল, 'নিন, গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য কোন সীমান্তের দিকে যান।'

'কিন্তু....কিন্তু, এর মানে কি ?'

'গাড়ি ঘোরান।'

অনেকক্ষণ ওরা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ঘর্মাক্ত অবস্থায় রোদ্দুরেই দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে গাড়িতে এসে উঠল ওয়েব। পরক্ষণেই গাড়ি ছেড়ে দিল ও।

'আমরা এবার কি করব, জ্যাক ?' লিওনোরা বলে উঠল।

'আমাদের গ্যাস দরকার। বড় রাস্তা ধরে চলতে ভয় পাচ্ছি। ওরা যদি গাছের গুঁড়ি ফেলে রাখে এবার।'

'চল আমরা পোর্টো রেলোর দিকে যাই।'

'হয়তো তাই যেতে হবে', বলল ওয়েব। 'ছোট বেলার একটা কবিতার কথা মনে পড়ছে। শুনবে সেটা ?'

'এগিয়ে গিয়ে মুখ লুকোলাম
দূর পাহাড়ের কোলে,
চেঁচিয়ে বলে পাথর তখন—
লুকিয়ে থাকার স্থান হবে না, যেতেই হবে চলে।'

'হ্যাঁ, মনে পড়ছে।'

'কবিতাটা কত সত্যি মনে হচ্ছে এখন', ওয়েব বলল।

একটু পরেই ওরা একটা গ্যাস স্টেশানে পৌঁছল। তিন জন লোক ওদের দেখে ছায়ার মতই এগিয়ে এল।

'সেনর', একজন বলে উঠল। ওদের মুখ পোড়া তামার মত।

'আমরা কিছু গ্যাস কিনতে চাই', ওয়েব বলল।

'আমাদের কাছে গ্যাস নেই', লোকটা জানাল।

'প্রতি গ্যালনের জন্য দশ পেসো দেব।'

'ঈশ্বরের শপথ, না।'

'কিন্তু আমাদের যে গ্যাস চাইই। না হলে গাড়ি আর চলবে না। তাহলে এখানে গাড়ি রেখে শহরে দেখতে যেতে হবে।'

'আমি গাড়িটা পাহারা দিতে পারি, সেনর। তবে চাবিটা রেখে যাবেন', লোকটা বলল।

'না, না, তা কখনও হয় না', লিওনোরা বলে উঠল।

ওয়েব কোন কথা না বলে লিওনোরাকে ইঙ্গিত করে নেমে পড়ল। তার পর চাবিটা লোকটার হাতে দিল।

'চমৎকার গাড়ি', লোকটা তারিফ করে বলে উঠল।

লিওনোরাও নেমে দাঁড়িয়েছিল। ওরা গাড়ি থেকে সুটকেশ দুটো নামিয়ে আনল।

ওরা আবার হাঁটতে শুরু করল।

'চার হাজার ডলারের গাড়িটা এইভাবে ফেলে যাব ?' লিওনোরা বলে উঠল।

ওয়েব ওর হাত ধরে দ্রুত হাঁটতে গিয়ে বলল, 'গাড়ি চলার হাতিয়ার। কিন্তু সেটা যখন চলে না তখন তার কোন দামই নেই। এই মুহূর্তে আমাদের হাঁটতে হবে—এটাই মূল কথা। গ্যাস ছাড়া এ গাড়ি মূল্যহীন বোঝা মাত্র। দুটো মজবুত পা এখন একশটা গাড়ির সমান। আমাদের হাঁটতেই হবে -।'

* * *

ওরা স্বামী-স্ত্রী কতক্ষণ হেঁটেছিল ওদের মনে নেই। আচমকা ওদের সামনে জেগে উঠল একটা গাড়ি। গাড়িটা

এ শহর ওয়েবের চেনা।

ওদেরই সামনে এসে থামল। 1929 সালের মডেলের একটা ফোর্ড গাড়ি। গাড়ি চালাচ্ছিল এক বৃদ্ধ। দেহে পুরনো পোশাক।

বৃদ্ধ গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল। 'আপনারা এভাবে হাঁটছেন কেন? গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।' ওয়েব উত্তর দিল।

'আমার নাম গারসিয়া। চলুন, পৌঁছে দেব আপনাদের।'

'ধন্যবাদ।'

লিওনোরা আর ওয়েব বৃদ্ধর গাড়িতে উঠে বসল।

পথ চলতে চলতে কথা শুরু করল বৃদ্ধ গারসিয়া।

'এই গাড়ি আমিই একদিন আবিষ্কার করেছিলাম। কবে তা আর মনে পড়ে না। আপনারা খবরের কাগজ পড়েন? আমি পড়ি না', কথা বলতে বলতে কেমন আনমনা হয়ে গেল গারসিয়া। 'অনেক কাল আগের একটা কাগজে পড়েছিলাম...সব সাদা মানুষরা শেষ হয়ে গেছে....কিন্তু আপনারা কোথা থেকে এলেন কে জানে?'

কোন উত্তর দিল না ওয়েব আর লিওনোরা।

বৃদ্ধ ওদের নামিয়ে দিল ছোট্ট শহর কলোনিয়ার একটু আগে। এ শহর ওয়েবের চেনা। এখানকার হোটেল এসপোসার মালিক সেনর এসপোসা ওর পরিচিত।

ওরা হোটেলে ঢুকে কাউকেই প্রথমে দেখতে পেল না। হঠাৎই একটা ঘর থেকে বেরিয়ে এল এসপোসা।

'চিনতে পারছেন, সেনর এসপোসা?' ওয়েব বলল।

'নিশ্চয়ই, সেনর। কিছু হয়েছে?'

'আমরা একটু আশ্রয় চাই—।'

'স্বচ্ছন্দে।'

'আমরা কালই রাজধানীতে যেতে চাই।'

মাথা নাড়ল এসপোসা। 'কোন উপায় নেই, সেনর। প্রতি শহরেই দাঙ্গা চলেছে, সাদা মানুষরা কেউ বেঁচে নেই। আপনাদের এখানেই থেকে যেতে হবে। আমার হোটেলে চাকরি দিতে পারি।'

'আমরা কালই চলে যাব—'

'অসম্ভব। আপনারা উন্মাদ। শুনে রাখুন, সাদা মানুষরা সবাই শেষ! শেষ! বুঝেছেন?'

'কিন্তু কি চাকরি দেবেন আমাদের।' ওয়েব প্রশ্ন করল।

'হোটেলের রান্নাঘরে। পৃথিবী বদলে গেছে, সেনর—। ভেবে দেখুন সেনর। হেঁটে কুড়ি দিনে রাজধানী যেতে পারেন —হয়তো কুড়ি বছরও লাগতে পারে। ভেবে দেখুন, সেনর। এখানে টাকা পাবেন, খাদ্য পাবেন, আশ্রয় পাবেন—।'

'কিন্তু—।'

'কোন কিন্তু নেই, সেনর। ভেবে দেখুন, এই পৃথিবীতে আমার বা আপনার কেউ আর বেঁচে নেই—সব, সবাই শেষ ....। এদেশের মানুষ আজ উন্মাদ হয়ে গেছে। ওই শুনুন, তাদের আনন্দ ধ্বনি....।'

'আমাদের যেতে দিন, সেনর এসপোসা,' ওয়েব বলল।

'এই পৃথিবী বড় খারাপ জায়গা, সেনর। আমরা কেউই জানি না আমরা কি করছি', দুঃখিত ভঙ্গীতে বলল এসপোসা। তারপর থেমে সে হাত বাড়িয়ে ধরল, 'বিদায়, সেনর—।'

মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যতাপের মধ্যে রাস্তায় নেমে এল জন ওয়েব আর লিওনোরা।

কেউ কোথাও নেই। নিস্তব্ধতা যেন তির তির করে কেঁপে চলেছে। ধীর পায়ে ওরা এগিয়ে চলল।

'আমরা পারব, জ্যাক', কাঁপা গলায় বলল লিওনোরা।

'পারব, পারতেই হবে।'

ওরা চলেছিল নতুন কোন দিগন্তের দিকে।

159/1বি, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা—25

# যাদুবর্গ

## সুব্রতকুমার রজক

যাদুবর্গ নামটা তোমরা কেউ কেউ শুনেছ হয়তো। এস, এই যাদুবর্গের যাদুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। নীচের ছবিটার বিশেষত্ব লক্ষ্য কর, দেখছ একটা

| | | |
|---|---|---|
| 8 | 1 | 6 |
| 3 | 5 | 7 |
| 4 | 9 | 2 |

বর্গাকার ঘরকে নটা ছোট ঘরে ভাগ করে 1 থেকে 9 পর্যন্ত সংখ্যা এলোমেলো ভাবে সাজান আছে। এক কাজ কর ওপর নিচ, পাশাপাশি আর কোনাকুনি সংখ্যাগুলো যোগ করে ফেল। কি দেখছ, প্রত্যেকবারই যোগফল 15 হচ্ছে, তাই না? একেবারে যাদুর মত না? এটা হলো $3 \times 3$ (3 by 3) মাপের যাদুবর্গ। যে সংখ্যাগুলো দিয়ে যাদুবর্গ তৈরি হবে তাদের common difference 1 না হয়ে অন্য কোন ধনাত্মক পূর্ণাংক সংখ্যা ( ধর x ) হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে 1, 3, 5…17 সংখ্যা এলোমেলো সাজিয়ে তৈরি 3 by 3 মাপের যাদুবর্গটি দেখ।

এইরকম একটা যাদুবর্গ নিজে তৈরি করতে পারলে খুব খুশী হতে, তাই না? ব্যাপারটা কঠিন নয় মোটেই।

| | | |
|---|---|---|
| 15 | 1 | 11 |
| 5 | 9 | 13 |
| 7 | 17 | 3 |

প্রথমে তোমাদের বিজোড় সংখ্যক ঘরের অর্থাৎ $3 \times 3$, $5 \times 5$, $7 \times 7$ ইত্যাদি আকারের যাদুবর্গ তৈরির কৌশলটা জানিয়ে দিই।

ধর 1 থেকে 25 পর্যন্ত সংখ্যা এলোমেলো সাজিয়ে একটি $5 \times 5$ (5 by 5) মাপের যাদুবর্গ তৈরি করতে হবে। বর্গের ওপরের সারির ডানদিকের প্রথম ঘরটিতে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি 1 বসাও। এবার ডানদিক থেকে ক্রমশঃ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 16 | 11 | 6 | 1 |
| 2 | 22 | 17 | 12 | 7 |
| 8 | 3 | 23 | 18 | 13 |
| 14 | 9 | 4 | 24 | 19 |
| 20 | 15 | 10 | 5 | 25 |

Common difference $(x) \times$ সারির সংখ্যা যোগ করে যাও। অর্থাৎ 1, $1+5=6$, $6+5=11$, $11+5=16$, $16+5=21$।

( $\because$ C. d.$(x) \times$ সারির সংখ্যা $= 1 \times 5$ )

এক কথায় প্রথম সারির সংখ্যাগুলো Arithmetic Progression এ থাকবে এবং Ist term = সবচেয়ে ছোট সংখ্যা।

Common difference $= x \times$ সারির সংখ্যা।

এবার দ্বিতীয় সারির বাঁদিকের প্রথম ঘরটিতে, প্রথম সারির ডানদিকের প্রথম সংখ্যাটির সঙ্গে x যোগ করে এবং পরের ঘরগুলোতে প্রথম সারির সংখ্যাগুলোর সঙ্গে কোনাকুনি C. d.(x) যোগ করে বসাও। তৃতীয় সারির বাঁদিকের প্রথম ঘরটিতেও দ্বিতীয় সারির ডানদিকের প্রথম সংখ্যাটির সঙ্গে C. d.(x) যোগ করে এবং পরের ঘরগুলোতে দ্বিতীয় সারির সংখ্যাগুলোর সঙ্গে কোনাকুনি C. d. (x) যোগ করে সংখ্যা বসাও। এইরূপ ভাবে চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি সারিগুলিতে সংখ্যা বসিয়ে A যাদু বর্গটি তৈরি কর।

তাহলে মোট তিনটি যাদুবর্গের নির্মাণ কৌশল তোমাদের শেখানো হল। এবার পরের তিনটি যাদুবর্গ তোমাদের নিজেদেরই তৈরি করতে হবে। তৈরি করা মোটেই কঠিন নয়। যেমন যেমন লেখা আছে তেমন তেমন সংখ্যাগুলি বসিয়ে যাও। প্রথমে আগের A যাদুবর্গের মতোই নিচের বাঁ-দিকের কোণার ঘরে ( অন্য কোণার ঘরে বসালেও হবে ) A বর্গের ওপরের সারির মাঝের সংখ্যাটি, 11 বসাও এবং কোনাকুনি পরের ঘরগুলিতে C. d.

.^) ক্রমশঃ যোগ করে যাও। এখানে 11, 12, 13, 14, 15··· ।

এখন এই সংখ্যাগুলো A বর্গের যে স্তম্ভে পাওয়া যাবে সেই সংখ্যাগুলো B বর্গে ঐ স্তম্ভে বসাও। বসানোর নিয়ম হচ্ছে যদি A বর্গের স্তম্ভে ঐ সংখ্যাটির পরে কোন সংখ্যা থাকে তবে B বর্গের পর পর বসিয়ে যাও নতুবা স্তম্ভের ওপর থেকে সংখ্যা নিয়ে বসাও আবার B বর্গে সংখ্যাটির পরে নিচের দিকে ঘর না থাকলে ওপর থেকে সংখ্যা বসাতে শুরু কর। উদাহরণ হিসেবে 14 A বর্গের প্রথম স্তম্ভে আছে অতএব 14-র পরে 20 বসিয়ে A বর্গের ওপর থেকে সংখ্যা নিয়ে 21, 2 বসাও এবং B বর্গের নিচের দিকে আর ঘর না থাকার জন্য ওপরের ঘরে 8 বসাও। সেইরূপ 11 A বর্গের তৃতীয় স্তম্ভে আছে এবং B বর্গে 11র পরে নিচের দিকে কোন ঘর না থাকার জন্য ওপর থেকে 17, 23, 4, 10 বসাও।

এতো গেলো বিজোড় মাপের যাদুবর্গের কথা। জোড় মাপেরও যাদুবর্গ তৈরি হতে পারে। জোড় মাপের যাদু-বর্গকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগের জোড় মাপের যাদুবর্গ যাদের সারিসংখ্যা অর্ধেক করলে জোড়সংখ্যা পাওয়া যায় তৈরি করা সহজ। উদাহরণ হিসেবে 1 থেকে 16 পর্যন্ত সংখ্যা এলোমেলো সাজিয়ে $4 \times 4$ (4 by 4) মাপের যাদুবর্গ তোমরা তৈরি করতে চেষ্টা কর।

এখানে $\frac{\text{সারি সংখ্যা}}{2} = \frac{4}{2} = 2$ ( জোড় সংখ্যা )

এখানেও দুটি বর্গ নিতে হবে—ধর একটি ক এবং অপরটি খ। ঘর কেটে নিয়ে ক বর্গে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটি 1, প্রথম সারির বাঁদিকের প্রথম ঘরটিতে এবং সবচেয়ে বড় সংখ্যাটি 16, শেষ সারির ডানদিকের প্রথম ঘরটিতে বসাও।

এবার প্রথম সারি থেকে clock-wise ভাবে অন্যান্য সারিগুলিতে নিচে-ওপরে, ওপরে-নিচে করে Common difference (x) ( এখানে—1 ) ক্রমশঃ বাড়াতে বাড়াতে এবং শেষ সারি থেকে অন্যান্য সারিগুলিতে ওপর-নিচে, নিচে ওপরে করে C. d. (x) কমাতে কমাতে যাও। এখানেই ক বর্গের কাজ শেষ।

এবার খ বর্গের প্রথম বা শেষ সারির বাঁদিকের কোণার ঘরটিতে ক বর্গের ওপরের সারির বাঁদিকের প্রথম সংখ্যাটি বসিয়ে কোনাকুনি পরের ঘরগুলিতে ক্রমশঃ

C. d. (x) × ( সারি সংখ্যা + 1 ) যোগ করে যাও।

অর্থাৎ 1, $1+5=6$, $6+5=11$, $11+5=16$।

[ ∵ C. d. (x) × ( সারি সংখ্যা + 1 ) $= 1 \times (4+1)$]

এবার খ বর্গে প্রথম বা শেষ সারির ডানদিকের ঘরে ক বর্গের ওপরের সারির ডানদিকের সংখ্যাটি বসাও এবং কোনাকুনি পরের ঘরগুলিতে ক্রমশঃ

C. d. (x) × ( সারি সংখ্যা—1 ) যোগ করে যাও।

অর্থাৎ 4, $4+3=7$, $7+3=10$, $10+3=13$।

[ ∵ C. d. (x) × ( সারি সংখ্যা − 1) $= 1 \times (4-1)$]

ক ও খ বর্গ তৈরি করার পর ক বর্গের দিকে লক্ষ্য কর, খ বর্গের সংখ্যাগুলো ক বর্গের যে স্তম্ভে পাওয়া যাবে সেই স্তম্ভের সংখ্যাগুলো খ বর্গের সংখ্যাগুলোর স্থান অনুযায়ী ওপর থেকে বা নিচ থেকে শুরু করে বসাও। খ বর্গ তৈরি হয়ে গেল।

জোড় যাদুবর্গের সারি সংখ্যা অর্ধেক করলে বিজোড় সংখ্যা পাওয়া যায় এরকম যাদুবর্গও তৈরি করা যায়।

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 64 | 55 | 46 | 37 | 28 | 19 | 10 | 1 |
| 2 | 74 | 65 | 56 | 47 | 38 | 29 | 20 | 11 |
| 12 | 3 | 75 | 66 | 57 | 48 | 39 | 30 | 21 |
| 22 | 13 | 4 | 76 | 67 | 58 | 49 | 40 | 31 |
| 32 | 23 | 14 | 5 | 77 | 68 | 59 | 50 | 41 |
| 42 | 33 | 24 | 15 | 6 | 78 | 69 | 60 | 51 |
| 52 | 43 | 34 | 25 | 16 | 7 | 79 | 70 | 61 |
| 62 | 53 | 44 | 35 | 26 | 17 | 8 | 80 | 71 |
| 72 | 63 | 54 | 45 | 36 | 27 | 18 | 9 | 81 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 58 | 69 | 80 | 1 | 12 | 23 | 34 | 45 |
| 57 | 68 | 79 | 9 | 11 | 22 | 33 | 44 | 46 |
| 67 | 78 | 8 | 10 | 21 | 32 | 43 | 54 | 56 |
| 77 | 7 | 18 | 20 | 31 | 42 | 53 | 55 | 66 |
| 6 | 17 | 19 | 30 | 41 | 52 | 63 | 65 | 76 |
| 16 | 27 | 29 | 40 | 51 | 62 | 64 | 75 | 5 |
| 26 | 28 | 39 | 50 | 61 | 72 | 74 | 4 | 15 |
| 36 | 38 | 49 | 60 | 71 | 73 | 3 | 14 | 25 |
| 37 | 48 | 59 | 70 | 81 | 2 | 13 | 24 | 35 |

$9 \times 9$ (9 by 9) মাপের যাদুবর্গ

কিন্তু তৈরি করার পদ্ধতি জটিল। যাদুবর্গ এক মজার যাদু। যাতে আরো ভাল করে বোঝ তাই $9 \times 9$ (9 by 9) এবং $8 \times 8$ (8 by 8) মাপের যাদুবর্গ তৈরি করে দেওয়া হল। ছবি দেখ ;

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 |
| 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 7 | 59 | 5 | 4 | 62 | 2 | 64 |
| 16 | 50 | 14 | 52 | 53 | 11 | 55 | 9 |
| 41 | 23 | 43 | 21 | 20 | 46 | 18 | 48 |
| 32 | 34 | 30 | 36 | 37 | 27 | 39 | 25 |
| 40 | 26 | 38 | 28 | 29 | 35 | 31 | 33 |
| 17 | 47 | 19 | 45 | 44 | 22 | 42 | 24 |
| 56 | 10 | 54 | 12 | 13 | 51 | 15 | 49 |
| 1 | 63 | 3 | 61 | 60 | 6 | 58 | 8 |

$8 \times 8$ (8 by 8) মাপের যাদুবর্গ

গ্রাম—পরাধি, পোষ্ট— বাঁকাটি,
ভায়া—ঘাটশিলা, সিংভূম, বিহার,
জেলা - সিংভূম ( বিহার )।

# বিজ্ঞানের খবর

## অমিত চক্রবর্তী

### সুর্মা থেকে বিপদ !

ছোট শিশুদের চোখে কাজল দেওয়ার রীতি চালু রয়েছে বহুদিন থেকেই। শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, চোখে কাজল-সুর্মা দেওয়ার প্রচলন আছে পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশেও।

কাজল নিয়ে বিশেষভাবে না হলেও, সুর্মা নিয়ে বিজ্ঞানীরা এখন যথেষ্টই আতঙ্কিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাফেলোর স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ্ নিউ ইয়র্কের শিশু-রোগ বিশেষজ্ঞ রবার্ট গাথরি সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ডক্টর গাথরির মতে—সুর্মার এক বিশেষ উপাদান গ্যালেন—চোখের পক্ষে যথেষ্ট বিপজ্জনক। গ্যালেনায় থাকে সীসের উপাদান যা চোখের মাধ্যমে শোষিত হয় রক্তে। এর থেকে শিশুদের আচরণগত নানা সমস্যা এমন কি জড়বুদ্ধিতা পর্যন্ত বিপর্যয় গড়ানো নেহাৎ অসম্ভব নয়। ডক্টর গাথরি কুয়েতের বিভিন্ন হাসপাতালের শিশুদের রক্ত পরীক্ষা করে দেখেছেন—যে সব মায়েরা বাচ্চাদের চোখে সুর্মা লাগান, সেই সব শিশুদের রক্তে সীসের মাত্রা বিপজ্জনকভাবে বেশি।

### চোখের ছানির প্রতিরোধে···

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখে ছানি পড়ার ঘটনার সঙ্গে আমরা কে না পরিচিত ? কিন্তু ছানি পড়া বন্ধ করা কিংবা তাকে বেশ কিছুদিন ঠেকিয়ে রাখাটা কি আদৌ সম্ভব ? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানী অ্যালেন টেইলর বলেছেন—আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যের উপাদানে সামান্য হেরফের ঘটিয়ে এটাকে সম্ভবপর করা যায়। চোখের ছানি এড়াতে খাবার দাবারে থাকা চাই প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি এবং ই ; এছাড়া চাই ম্যাঙ্গানীজ ও ম্যাগনেসিয়াম জাতীয় খনিজ পদার্থ। কেন ও কিভাবে চোখে ছানি পড়ে এ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে অ্যালেন টেইলর এই তথ্যগুলি আবিষ্কার করেছেন। ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ যে চোখকে সূর্যের আলো থেকে রক্ষা করে—এটা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। অ্যালেন টেইলর বর্তমানে ইউ-এস-ডিপার্টমেণ্ট অফ এগ্রিকালচারের অধীন পুষ্টি গবেষণা কেন্দ্রে বার্ধক্য সম্পর্কে গবেষণা করছেন।

# লবণ খাওয়ার প্রয়োজন আছে কি ?

## সুব্রত শীল

দারুণ মুখরোচক খাবার—গন্ধে জিভে জল এসে যাচ্ছে। সুগন্ধ আসছে কোথা থেকে ? দেখবেন তাতে অতিরিক্ত লবণ মেশানো হয়েছে—লবণ থেকেই আসছে এই সুগন্ধ। এমনকি সাধারণ খাদ্যেও লবণ প্রয়োজনীয় সুগন্ধ আনে। প্রশ্ন হ'ল বেশি লবণ খাওয়াটা কি ঠিক ? বোধ হয় না। চিকিৎসকদের মতে খাদ্যের অতিরিক্ত সোডিয়াম উচ্চ রক্তচাপ, মেদবহুলতা, হৃদ্‌রোগ, ধমনীর রোগ এবং দন্তক্ষয় সৃষ্টি করে। এছাড়াও পাগলামী, উদ্বেগ, চুলের পতন এবং অন্যান্য কিছু ছোট ছোট উপসর্গের সঙ্গে অতিরিক্ত লবণ সেবনের কিছু যোগাযোগ রয়েছে। দেখা গেছে, শিশুরা যদি খাদ্যের ·25% এর বেশি পরিমাণ লবণযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করে তবে প্রাপ্তবয়সে তাদের উচ্চ রক্তচাপ দেখা দিতে পারে।

এখন দেখা যাক্, আমরা কি খাদ্যে লবণ ( সোডিয়াম ক্লোরাইড ) বা অন্য কোন সোডিয়াম লবণ হিসাবে অস্বাভাবিক পরিমাণ সোডিয়াম গ্রহণ করছি ? এর জন্য বিভিন্ন খাদ্যে সোডিয়ামের পরিমাণটা একটু যাচাই করে নেওয়া যাক্। ধরুন আমরা যে সমস্ত আঁধারীতে ( Camed ) ও ফ্রোজেন শাকসব্জি, আঁধারীকৃত ঝোল, মাছ, মাংস, যব, গম, লবণাক্ত মাছ বা মাংস, বাদাম, চিপস্, ক্যাকারস্, বিস্কুট, পপকর্ন, মাখন বা চীজ খাই এগুলিতে অস্বাভাবিক পরিমাণে সোডিয়াম রয়েছে। শহরে আমাদের অধিকাংশ খাদ্যের মধ্যেই উপরিউক্ত খাদ্যগুলি বেশি থাকে বলে সোডিয়ামের অস্বাভাবিক আধিক্য দেখা যায়। তাছাড়া, আজকাল যে ব্রাইনিং ( Brining ), পিকলিং ( Pickling ), কিউরিং ( Curing ), বা সল্টিং ( Solting ) করে খাদ্যকে সুরক্ষা করা হয় তাতেও অনেক লবণ যোগ করা হয়।

তবে কেন এত লবণ ব্যবহার করা হয় ? আসলে খাদ্য তৈরি করার সময় সাধারণ লবণের মত এত সস্তা কিন্তু এত গুরুত্বপূর্ণ আর কোন রাসায়নিক নেই। তাছাড়া, আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ রয়েছে। সেটা হচ্ছে, সমস্ত রকম খাদ্য সংরক্ষকের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সাধারণ লবণ সর্বাপেক্ষা নিরাপদ। সাধারণ লবণ খাদ্যে অনুজীবের বৃদ্ধি রোধ করে। এটি খাদ্যের বর্ণ পরিবর্তনে বাধা দেয় এবং বাজে গন্ধ ঢেকে দেয়। লবণ খাদ্য শুকোতে এবং ঠাণ্ডা করতে সাহায্য করে। মাছ বা মাংস লবণ দিয়ে শুকিয়ে রেখে দেওয়া হয় কিংবা বিভিন্ন শাকসব্জি বা ফল লবণ মাখিয়ে শুকিয়ে দীর্ঘদিনের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। আবার ঠাণ্ডা করবার কাজে বরফের গুঁড়োর সঙ্গে হিমমিশ্রণে ব্যবহৃত হয়।

সাধারণ লবণ ছাড়াও আরও অন্যান্য সোডিয়াম লবণ বিভিন্ন খাদ্যে ব্যবহৃত হয়। যেমন মনে করুন, কেক্, প্যাস্ট্রি, পাউরুটি এবং সমস্তরকম সেঁকা খাদ্য, বেকিং সোডা বা সোডিয়াম বাইকার্বনেট ব্যবহার করা হয়। মাংসের রান্নায় সোডিয়াম নাইট্রেট এবং নাইট্রাইট সংরক্ষক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। উচ্চমাত্রায় সুগন্ধীকারক বা গন্ধ আনয়নকারক পদার্থ হিসাবে অনেক খাদ্যেই মনোসোডিয়াম গ্লুটামেট থাকতে পারে। বাস্তবিক পক্ষে খাদ্যে যত অ্যাডিটিভ ব্যবহার করা হয় তার বেশির ভাগই সোডিয়াম যৌগ। নেশাহীন পানীয়, ঔষধপত্র, এমনকি পানীয় জলেও সোডিয়াম থাকে। কিছু প্রাকৃতিক জলে ত' প্রচুর পরিমাণ সোডিয়াম লবণ থাকে এবং তার কিছুটা আবার সোডিয়াম ক্লোরাইড। জল মৃদুকরণের জন্য কিছুটা সোডিয়াম জলের মধ্যে চলে আসে। দেখা গেছে, খাদ্যে যদি প্রসেসড্ খাদ্যের পরিমাণ বেশি থাকে তবে আমরা স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় 20 গুণ বেশি সোডিয়াম লবণ সেবন করি।

এখন প্রশ্ন হল, আমাদের কতটা সোডিয়াম প্রয়োজন ? খাদ্যে স্বাভাবিকভাবে যতটা সোডিয়াম আছে তাই। এর চেয়ে বেশি সোডিয়ামের কোন প্রয়োজন নেই। চিকিৎসকরাও তাই বলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা প্রচুর লবণ খাই। আমাদের পূর্বপুরুষরা সোডিয়াম ক্লোরাইডের হজমগুণে সম্বন্ধে এত বিশ্বস্ত ছিলেন যে নিজেরা ত' সেবন করতেন এমনকি সুযোগ পেলেই শিশুর খাদ্যেও লবণ যোগ করতে চান। কিন্তু তারা বোধ হয় জানেন না যে, শিশুটি তার আগেই গরুর দুধ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লবণ খাওয়ার অভ্যাসটি শুরু করে দিয়েছে। কেননা, কৃষকেরা গরুর দুধ বাড়ানোর জন্য গরুর খাদ্যে যথেষ্ট পরিমাণে লবণ মিশিয়ে দেয়।

কাজেই, পুরাতন, নতুন আমরা সবাই লবণের সবিশেষ ভক্ত। কিন্তু আজ না হলেও জীবনের কোন এক সময়ে এটা শারীরিক অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুতরাং আর দেরী নয়। এখনই লবণের পরিমাণ কাটছাট করা উচিত সবারই, এমনকি শিশু পর্যন্ত।

---

এক—7/8, লাবনী এস্টেট, সল্টলেক, কলি-64।

# উটপাখি

ছবিটা দেখেই বুঝতে পারছ—এটা উটপাখি। ডানা আছে অথচ উড়তে পারে না যে সব পাখি, উটপাখি তাদের মধ্যে অন্যতম। আফ্রিকাবাসী উটপাখিরা তিন রকম প্রজাতির হয়। জীবন্ত পাখিদের মধ্যে উটপাখিই সর্ববৃহৎ। দেহটি খুবই মোটাসোটা, পা দু'খানি খুবই দীর্ঘ ও শক্তিশালী। বাঁকানো গলাটি খুবই লম্বা, কিন্তু মাথাটি খুবই ছোট। উচ্চতায় এরা আট ফুট পর্যন্ত হ'য়ে থাকে, ওজন তিনশো পাউণ্ড পর্যন্ত হয়। এদের পায়ের আঙ্গুল মাত্র দু'টি। একটি বড়, অপরটি তুলনামূলকভাবে খুবই ছোট। স্ত্রীদের চেয়ে পুরুষেরা আকারে বড় হয়। এদের অর্থাৎ পুরুষদের পালকের রং কালো, ডানার রং সাদা এবং লেজটি লোমাবৃত। স্ত্রী উটপাখির গায়ের রং বাদামী পাটকিলে। বাচ্চাদেরও গায়ের রঙ অমনি হয়। এশিয়া-মাইনর অথবা আফ্রিকার মরুভূমিতে অথবা বালুকাময় ঝোপ-জঙ্গলে উটপাখিরা বাস করে। বালিতে আঙ্গুলের সাহায্যে পুরুষ উটপাখি আঁচড়ে আঁচড়ে গর্ত করে। সেই গর্তের মধ্যে স্ত্রী-পাখি এক সঙ্গে প্রায় পনেরটি বড় বড় ডিম পাড়ে। পুরুষ পাখি ছয় সপ্তাহ ধরে ডিমে তা দিয়ে বাচ্চা ফোটায়।

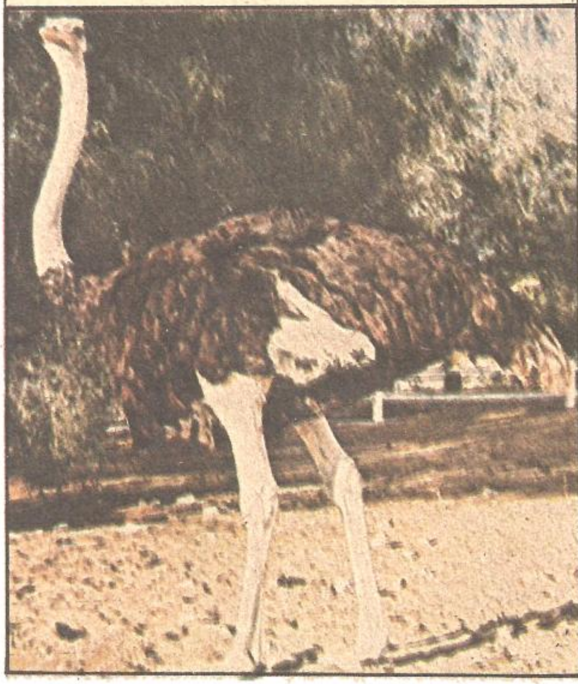

# নিউট্‌স্‌

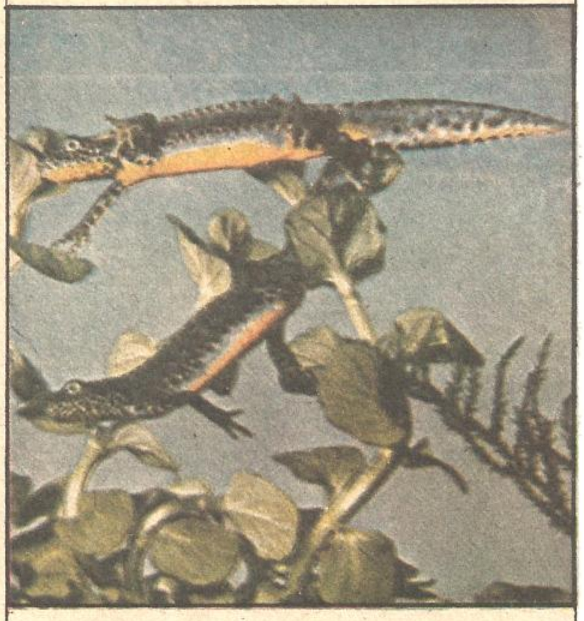

দীর্ঘ লেজযুক্ত উভচর প্রাণী, যারা জলের উপর কম নির্ভরশীল, তাদেরই 'স্যালামাণ্ডার' বলা হয়। ছবিতে যে প্রাণী দুটি দেখছ তাদের নাম 'নিউট্‌স্‌'। এরা স্যালামাণ্ডার গোষ্ঠীভুক্ত প্রাণী। জীবনের বেশ কিছুটা সময় তারা জলেই বাস করে। অবশ্য বছরের বেশির ভাগ সময় এদের ডাঙ্গাতেই দেখা যায়। ডাঙ্গায় এরা শীতকালে পাথরের নিচে লুকিয়ে থাকে। সুযোগ বুঝে এরা গাছ-পালায় চড়ে কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড় ধরে খায়। তারপর ডিমপাড়ার সময় হলে জলে গিয়ে বাস করে। এদের ডিম ফুটে লম্বা স্বচ্ছ ব্যাঙাচির আকৃতিযুক্ত বাচ্চা বেরিয়ে আসে। বাচ্চাদের দেহে পালকাবৃত ফুলকা থাকে। বড় না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চাগুলি জলজ কীটপতঙ্গ শিকার করেই খায়। তারপর অর্থাৎ বড় হলে পর এদের ফুলকা খসে পড়ে। তখন এরা বাতাসে শ্বাস-প্রশ্বাস কার্য চালাতে পারে এবং ডাঙ্গায় গিয়ে বাস করে। ছবিতে রঙ বেরঙের যে নিউট দু'টি দেখছো—তারা হলো 'আলপাইন নিউট্‌স্‌'।

অমরনাথ রায়

# বুদ্ধি শুদ্ধি

## বার্মুডার ছ'কোণ ঘুড়ি

ঘুড়ি বহুকাল ধরে আছে আর থাকবেও। কোথায় প্রথম ঘুড়ি আবিষ্কার হয় তা তোমরা ত জানোই। চীনদেশে। আর তা হয় খ্রীস্ট জন্মের এক হাজার বছর আগে। নানান আচার অনুষ্ঠানে আর বর্ণাঢ্য উৎসবে ঘুড়ির সমাদর সর্বদেশে সর্বকালে। আর এখন শুধু উৎসব কেন শক্তিশালী সব ঘুড়ি বানিয়ে তা দিয়ে যন্ত্রপাতি এমন কি একটা গোটা জীপ গাড়িকেই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

এখানে একটা ছ'কোণ ঘুড়ির নমুনা দিলাম। বানিয়ে ফেল। হাল্কা হাওয়ায় ওড়ার পক্ষে এটি খুব ভালো। এই ঘুড়িটির আদর বার্মুডায়। ওখানে বার্ষিক ঘুড়ির উৎসবে এরকম এক ঝাঁক ঘুড়ি প্রায় সারাদিন বা একাধিক দিন ধরেও আকাশে ওড়ে।

সরঞ্জাম যা লাগবে এটি বানাতে তা হল—(ক) 75 সেমি এর তিনটি কাঠি, (খ) ঘুড়ির কাগজ 80 সেমি. × 80 সেমি., (গ) আঠা, ছুরি, কাঁচি আর সুতো। ছবিতে 1, 2, 3, ইত্যাদি নম্বর অনুযায়ী দেখলেই তৈরির কৌশল পেয়ে যাবে। তবে হ্যাঁ, অবশ্যই দুটো ল্যাজ লাগাবে। নইলে শুধুই ঘুরপাক খাবে, উড়বে না। ল্যাজের সাইজ? তা ধর 300 সেমি. × 5 সেমি.।

লেখা ও ছবি: সমীর মণ্ডল

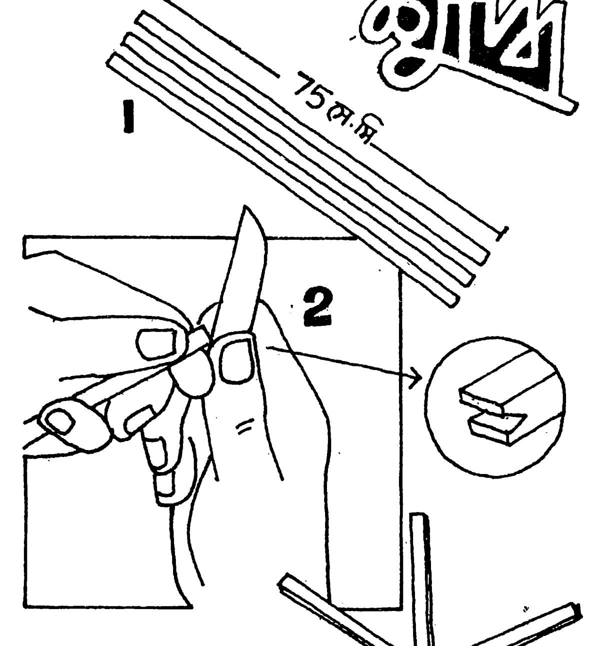


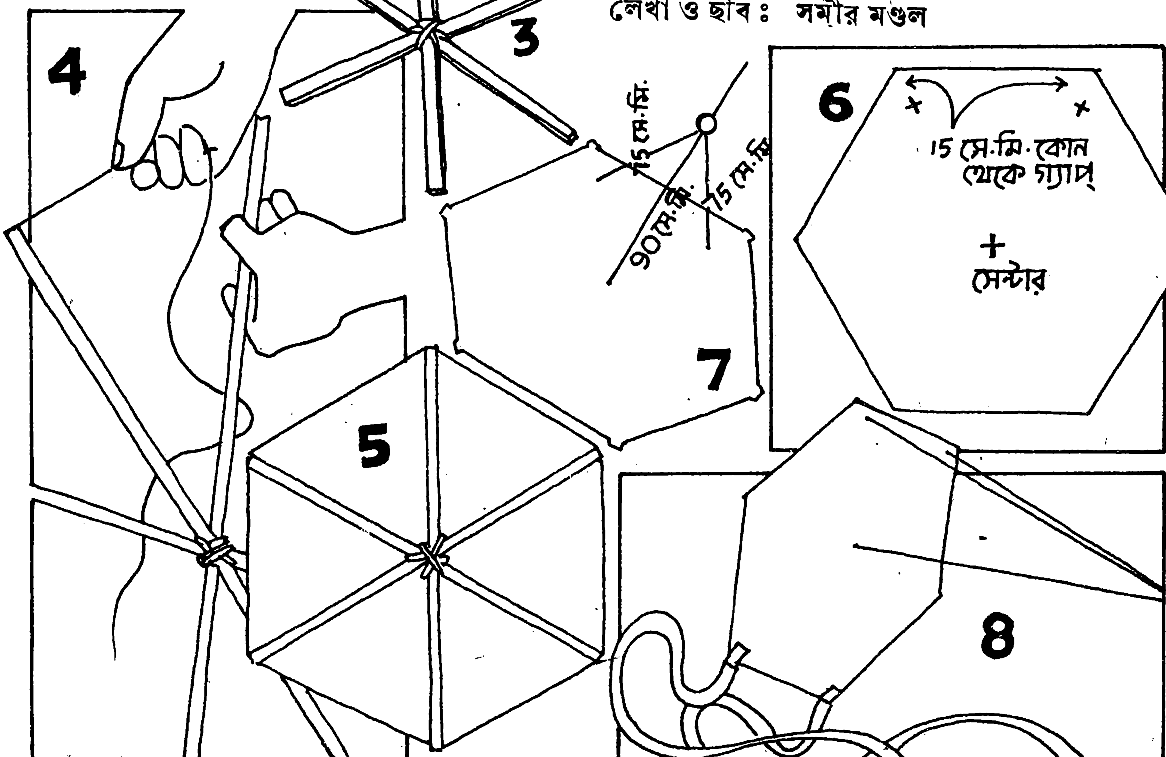

# বুদ্ধি শুদ্ধি

## আইসক্রীম আর আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট

আইসক্রীমের গল্প তা খুবই পুরানো। এখন যে সব সুস্বাদু আর রং বেরঙের সুগন্ধী আইসক্রীম তোমরা খাও তার এই মানে আসতে সময় লেগেছে কম করে দু হাজার বছর। কথিত আছে রোমানরাই পৃথিবীতে প্রথম আইসক্রীম খাওয়ার ব্যাপারে সৌভাগ্যবান। রোম সম্রাটরা তাঁদের অতিথি আপ্যায়নে এর ব্যবহার করে থাকতেন। কিন্তু আইসক্রীম বানানোর মেশিন ত ছিল না। ফ্রিজ্ বা রেফ্রিজারেটর-এর কথা কল্পনাতেও আসেনি। একেবারেই প্রকৃতির জমা বরফ দিয়েই ঐ ঠাণ্ডা খাদ্য তৈরির ব্যবস্থা। তার জন্য ঝামেলাও কি কম। কোন ভোজসভাতে ঠাণ্ডা খাদ্য মানেই মাসখানেক আগেই তার প্রস্তুতি। একদল ক্রীতদাস আল্পস্ পর্বত থেকে রোম পর্যন্ত রিলে করে বয়ে আনবে বরফ। তারপর তাতে মিষ্টি আর গন্ধ মিশিয়ে পরিবেশন করা হবে। এর জন্য সময় ত চাই আর পাহাড়ের গা থেকে যে পরিমাণ বরফ নেওয়া হত তার অনেক কম অংশই রোমে এসে পৌঁছাত। কেন তা ত বুঝতেই পারছ।

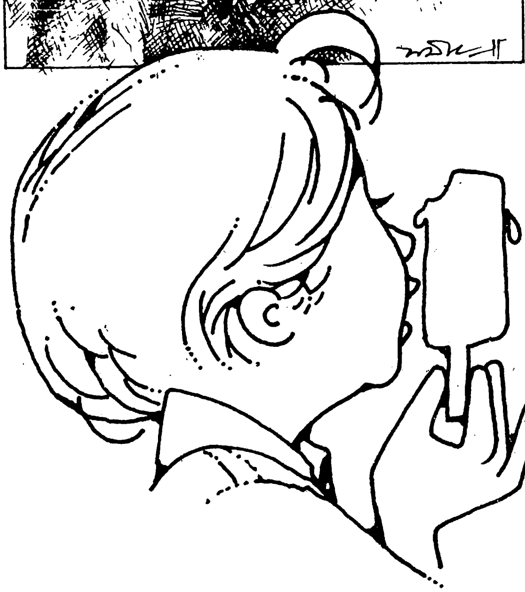

ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস্-এর জন্য আইসক্রীম বানানো আলাদা লোক রাখা ছিল। এ ঘটনা 1640 খ্রীস্টাব্দের। তিনি এটি এতই পছন্দ করতেন যে প্রস্তুতকারককে সারা-জীবনের জন্য মোটা মাইনে দিয়ে রাখা হয়েছিল। রেখে-ছিলেন আর একটা কারণে যাতে বাইরে সেই প্রস্তুত প্রণালী ফাঁস না হয়।

জনসাধারণের জন্য প্রথম আইসক্রীমের দোকান খোলা হয় প্যারিসে 1660 খ্রীস্টাব্দে। শুরু করেন ইটালিয়ানরা। আমেরিকায় আইসক্রীমের দোকান খোলা হয় এরও শ'খানেক বছর বাদে 1777 খ্রীস্টাব্দ নাগাদ।

আমেরিকার কথায় যখন এলাম তখন সেই বিখ্যাত খবরটা দিই। প্রেসিডেণ্ট জর্জ ওয়াশিংটন, ছিলেন যাকে বলে আইসক্রীম পেটুক। তাঁর নিজের আইসক্রীম বানানোর দস্তা নির্মিত দুটি পাত্র ছিল। এক গ্রীষ্মে আইসক্রীমের পিছনে তাঁর খরচ হয়ে গেল 200 ডলার। সেই সময়ে অর্থাৎ 1790 খ্রীস্টাব্দে 200 ডলার মানে ভাবতে পার কি রকম কাঁড়ি কাঁড়ি আইসক্রীম তিনি খেয়েছিলেন ?

**লেখা ও ছবি : সমীর মণ্ডল**

## ওপাল

'ওপাল' নামক খনিজ পদার্থটিকে রসায়নবিদেরা সোদক সিলিকা ( $SiO_2.nH_2O$ ) আখ্যা দিয়ে থাকেন। ওপালকে অনিয়তাকার অবস্থায় পাওয়া যায়। মোজ স্কেলে এর কাঠিন্য $5\frac{1}{2}$ থেকে $6\frac{1}{2}$ এর মধ্যে। এর কোন ভগ্নতল নেই। খনিজটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা একত্রিত এবং ঘনসন্নিবিষ্ট হ'য়ে অনেক সময় এক একটি বিরাট পিণ্ডের আকার ধারণ করে এবং পিণ্ডটি সচ্ছিদ্র হয়, ভঙ্গুর হয়। ওপাল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বচ্ছ, অবশ্য কখনও কখনও প্রায় অস্বচ্ছ অবস্থাতেও একে পাওয়া যায়। খনিজটি কখনও বর্ণহীন, কখনও সাদা, কখনও নীলাভ-সাদা, কখনও পীত, কমলা, সবুজাভ এবং কখনও বা লালাভ-বাদামী রঙের হয়। আলো পড়লে এর পিণ্ডের মধ্যে রঙের বিচিত্র খেলা দেখতে পাওয়া যায়। অতি বেগুনী রশ্মিতে রাখলে ওপাল পিণ্ডতে সবুজ হ'তে পীতাভ সবুজ বর্ণচ্ছটা দেখা যায়। বিভিন্ন ভূতাত্ত্বিক পরিবেশে নিম্ন উষ্ণতায় এই খনিজটি সৃষ্টি হয়। ক্যালিফোর্নিয়া, নেভাদা, সাউথ ডাকোটা, কলোরাডো, অ্যারিজোনা, হাঙ্গেরী, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি অনেক জায়গাতেই এই খনিজটি মেলে। 'ওপাল' রত্ন-পাথর

হিসাবে সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়ে থাকে। বর্ণ বৈচিত্র্য অনুযায়ী ওপালকে প্রধানতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—কালো ওপাল, সাদা ওপাল এবং আগুন রঙের ওপাল। প্রথমোক্ত ওপাল-এর রঙ অত্যন্ত গাঢ় পার্টকিলে নীল অথবা কালোও হয়। দ্বিতীয়োক্ত ওপাল-এর রঙ খুবই হাল্‌কা-সাদা হয় এবং তৃতীয়োক্ত ওপাল হলুদ, কমলা অথবা লাল রঙের হয়। রত্ন পাথর 'ওপাল'-এর চাহিদা দিন দিন বাড়ছে বই কমছে না।

## জারকন

'জারকন' নামক খনিজ পদার্থটিকে আমরা 'গোমেদ' নামে অভিহিত করে থাকি। শুধু তাই নয়, গ্রহ-শান্তির উদ্দেশ্যে আমরা অনেকেই আংটিতে গোমেদ ধারণ করে থাকি। ঠিকমতো কাটতে পারলে উচ্চ প্রতি-

সরাংকের জন্যে এই রত্ন-পাথরটির স্ফটিকের ঔজ্জ্বল্য অত্যন্ত মনোরম হয়। রসায়ন বিজ্ঞানীদের কাছে 'জারকন' বা গোমেদের পরিচয় হলো জারকোনিয়াম সিলিকেট ($ZrSiO_4$) রূপে। মোজ স্কেলে এর কাঠিন্য $7\frac{1}{2}$, এর কেলাস চতুর্ভুজাকৃতি, দ্বি-পিরামিডাকৃতি, এমন কি প্রিজমাকৃতিও হয়। জারকনের স্ফটিক কাচের মত স্বচ্ছ, কিন্তু কোনটিতে সবুজ, কোনটিতে পার্টকিলে, কোনটিতে হলুদ বা লাল রং দেখা যায়। আগ্নেয় অথবা পাললিক শিলাস্তরের অভ্যন্তর থেকে এই খনিজটিকে উদ্ধার করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডো, সাউথ-ডাকোটা, টেক্সাস, ওকলাহামা, নর্থ ক্যারোলিনা ও নিউজার্সিতে প্রচুর পরিমাণে এই খনিজটি পাওয়া যায়। এ ভিন্ন ব্রাজিল, কানাডা, নরওয়ে, ফ্রান্স, ইটালী, জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়ার কোন কোন অঞ্চলেও জারকন মেলে। রত্ন-পাথর হিসাবে এর ব্যবহার প্রধান হলেও জারকন-নির্মিত ইট কাচ-শিল্পে ব্যবহৃত হয়। ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণচ্ছটায় হীরার পরেই জারকন বা গোমেদের স্থান। সেইজন্যে এর অপর নাম 'নীচবজ্র'। ভারতে রক্তপীত গোমেদের কদর বেশি।

অমরনাথ রায়

# ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় জয়ন্ত দত্ত

## ফেব্রুয়ারি '87-এ প্রকাশিত আই-কিউ-টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে ( আগে আসার ভিত্তিতে ) যে দশ জন সার্টিফিকেট পাবে :

1. **সোমেন চৌধুরী**, 3/2, লক্ষ্মণ দাস লেন, হাওড়া-1।
2. **গৌতম মজুমদার**, প্রযত্নে, পি. কে. মজুমদার ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার্স অভয়কানন, বোরহাট, পোস্ট—নূতনগঞ্জ, বর্ধমান—113104।
3. **রুণু নিয়োগী**, প্রযত্নে, রবীন্দ্রনাথ নিয়োগী, গ্রাম—পানপুর, পোস্ট—নারায়ণপুর, উত্তর 24-পরগণা-743125।
4. **সুদীপ্ত সেনগুপ্ত**, প্রযত্নে, মদনমোহন সেনগুপ্ত, পোস্ট—রামপুরহাট বিবেকানন্দ রোড, বীরভূম।
5. **শুভ্রা মোদক**, প্রযত্নে, সুকুমার মোদক, গ্রাম + পোস্ট—আকনা, ভায়া—মগরা, হুগলী।
6. **স্বরূপ সিংহ**, কাঁথি হাইস্কুল, শ্রেণী—নবম, পোস্ট—কাঁথি, মেদিনীপুর।
7. **মহুয়া ঘোষ**, প্রযত্নে, পি. এস. ঘোষ, 1/1B, রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলকাতা—700 054।
8. **বিকাশকুমার মণ্ডল**, গ্রাম + পোস্ট—ময়না কল্যাগাছিয়া, মেদিনীপুর।
9. **মদনমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়**, প্রযত্নে, সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এন. রোড, গ্রাম + পোস্ট—রাজপুর, দঃ 24-পরগণা।
10. **অঞ্জন সেনগুপ্ত**, প্রযত্নে, তাপস সেনগুপ্ত, পোস্ট—বাসরহাট, [ আশ্রমপাড়া, নৈহাট্টি ] উঃ 24-পরগনা।

## ফেব্রুয়ারি '87 সংখ্যায় প্রকাশিত জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সবকটি-প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে ( আগে আসার ভিত্তিতে ) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে :

1. **প্রদীপ দাস**, প্রযত্নে, করুণাময় দাস, গ্রাম—উটপাথর, পোস্ট—নিমপুরা, জেলা—মেদিনীপুর।
2. **মালা ঘোষ**, প্রযত্নে, বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ, 12, রোজভিলা পাড়া, জেলা—বর্ধমান।
3. **সোমেন মণ্ডল**, প্রযত্নে, চিত্তরঞ্জন মণ্ডল, ডোভারলেন এক্সটেনশন, ব্লক-2, ফ্ল্যাট নং-K-1, কলকাতা—700 029

## ফেব্রুয়ারি '87-এ প্রকাশিত জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে :

**কলকাতা :** সুনন্দিতা গঙ্গোপাধ্যায়, নিতাই বসাক, রবিশঙ্কর ভট্টাচার্য, অচ্যুতকুমার বেহেরা।

**24-পরগনা :** সন্দীপ মাইতি, অঞ্জন সেনগুপ্ত, গৌতম মণ্ডল।

**হাওড়া :** শেলী সাহু, সোনালী চৌধুরী।

**হুগলী :** শান্তনু ব্যানার্জী। **বর্ধমান :** মহুয়া দাঁ। **মেদিনীপুর :** মহম্মদ ফিরোজ বিশ্বাস, পার্থপ্রতিম ঘোষ, বিকাশকুমার মণ্ডল, আনন্দকুমার রায়, জয়ন্তকুমার মজুমদার। **মালদহ :** অরুণায়ন শর্মা

---

গত এক বছরে যাঁদের মডেল কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁদের পত্রিকার দপ্তরে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

---

**ফেব্রুয়ারি '87-এ প্রকাশিত জুনিয়র ফোটো ক্যুইজ কনটেস্ট-এর**
**সঠিক উত্তর দিয়ে যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ**

1. মৈত্রেয়ী দত্ত, প্রযত্নে, সুরেশ চন্দ্র দত্ত, A/12, শরৎ পল্লী, গ্রাম+পোস্ট—মেদিনীপুর, পিনঃ—721101।
2. রুবি সূত্রধর, নিউ কলোনী, বঙাইগাঁও, আসাম—783380।
3. প্রদীপ রঞ্জন সূত্রধর, নিউ কলোনী, বঙাইগাঁও, আসাম—783380।

**ফেব্রুয়ারি '87-এ প্রকাশিত জুনিয়র ফোটো ক্যুইজ কনটেস্ট-এর**
**সঠিক উত্তর আরও একজন দিতে পেরেছে ঃ**

**24-পরগনা :** অঞ্জন সেনগুপ্ত।

**ফেব্রুয়ারি '87-এ প্রকাশিত সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সঠিক উত্তর দিয়ে**
**( আগে আসার ভিত্তিতে ) যে তিন জন পুরস্কৃত হবে :**

1. ধ্রুব দাসমহলানবীশ, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং।
2. সৌমেন হাজরা চৌধুরী, প্রযত্নে, অজয় হাজরা চৌধুরী, গ্রাম—অভিরামপুর, পোস্ট—মকদুমপুর জেলা—মালদহ।
3. তপনকুমার বসাক, প্রযত্নে আনন্দমোহন বসাক, গ্রাম-2নং নূতন ফুলিয়া মাঠপাড়া, পোস্ট—ফুলিয়া কলোনী, নদীয়া—741402।

**ফেব্রুয়ারি '87-এ প্রকাশিত সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের**
**সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে :**

**কলকাতা :** জয়ন্ত ধর, রঞ্জিতা সাহা, আনন্দ্য দাস, অচ্যুৎ দাঁ।
**হাওড়া :** সৈকত বিশ্বাস, সঞ্জীবন চক্রবর্তী।
**হুগলী :** অশোককুমার কুমার, উত্তম দত্ত, অঙ্গনা বসাক, সুভাশিস কুণ্ডু।
**বর্ধমান ঃ** সেখ শরাফৎ হোসেন, আশিস মণ্ডল, তরুণতপন গরাই, মিনদীপা দাঁ।
**মেদিনীপুর :** রাজেশ গিরি, অপরাজিতা দত্ত মজুমদার, তরুণকুমার বেরা, সুব্রতেশ রায়।
**নদীয়া ঃ** মৈত্রেয় মণ্ডল, শুভাশিস বিশ্বাস, শিপ্রা পাল।

**ফেব্রুয়ারি '87-এ প্রকাশিত সিনিয়র ফোটো ক্যুইজের সঠিক**
**উত্তর একজন মাত্র দিতে পেরেছে ঃ**

**শিপ্রা পাল**, প্রযত্নে, স্নেহাংশু পাল, পোস্ট—চাকদহ ( নেতাজী পার্ক ), জেলা—নদীয়া।

---

## আগামী সংখ্যা থেকে

ছোটদের দপ্তরের নাম পরিবর্তন করে "কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ" করা হল। তোমরা ছোটদের দপ্তরের যাবতীয় লেখাপত্র ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতার উত্তর প্রভৃতি পরিচালক "কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ" এই ভাবে পাঠাবে।

---

# এ. সি. ব্যাটারি এলিমিনেটর / শুভদীপ মল্লিক

আজকে আমরা যে এলিমিনেটর মডেলটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি তৈরি করা অত্যন্ত সহজ এবং আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র অনেক কম লাগে। এই মডেলটি তৈরি করতে খুব বেশি হলে 30-35 টাকার মতো খরচা হবে। তাহলে এসো, আমরা চট্‌পট্‌ এলিমিনেটর বানিয়ে ফেলি।

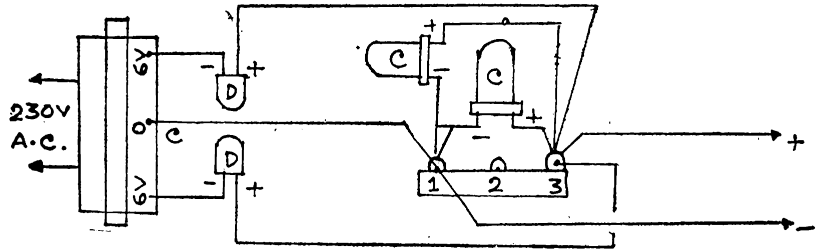


CIRCUIT DIAGRAM

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র—

১। ট্রান্সফরমার : 6-0-6 (5mA) Centre Tapped একটা

২। ডায়োড : DR 25 বা DR 50 দুটো
অথবা IN 1(07 "

৩। কনডেন্সার : 1000 mfd 12V দুটো

৪। ট্যাগ : 3-way একটা

এবারে সার্কিট দেখে প্রতিটি পার্ট্‌স ভালো করে ঝালাই করো। ডায়োড দুটির নেগেটিভ প্রান্ত ( – ) লাগিয়ে দিতে হবে 6 volt লেখা পয়েন্ট দুটোতে। পজেটিভ প্রান্ত দুটি এনে লাগিয়ে দিতে হবে ট্যাগের 3 নম্বর পয়েন্টে। O লেখা বা C লেখা পয়েন্ট থেকে একটা তার সরাসরি 1 নম্বর পয়েন্টে চলে আসবে। এবারে কণ্ডেন্সার দুটো 1 আর 3 নম্বর পয়েন্টে লাগিয়ে দিতে হবে।

এর অর্থ হলো দুটি তারের মধ্যে কোনো সংযোগ হবে না। এবারে 1 এবং 3 নম্বর পয়েন্টে দুটি তার ঝালাই করে দাও। এরাই হবে output-এর যথাক্রমে নেগেটিভ এবং পজেটিভ প্রান্ত। যদি তোমার 6V, 9V এবং 12V আছে এইরকম এলিমিনেটর প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে বাজারে ট্রান্সফরমার পাওয়া যায় যাতে ঐ রকম আলাদা আলদা ভোল্টেজের জন্য পয়েন্ট আছে। তবে তিনটি আলাদা ভোল্টেজের এলিমিনেটর তৈরি করতে একটা 3-way ব্যাণ্ড সুইচ্‌ ( Band Switch )-এর প্রয়োজন হবে।

---

ডায়মণ্ড হারবার, ২৪ পরগনা।

---

## অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

এপ্রিল সংখ্যার সিনিয়র ও জুনিয়র ক্যুইজ এবং ফটো কুইজ কনটেস্টের উপহার।

বিমান বসুর

**নক্ষত্র পরিচয়**

গত এক বছর ( মার্চ '87 পর্যন্ত ) প্রকাশিত সিনিয়র, জুনিয়র কুইজ কনটেস্ট, ফটো ক্যুইজ ও আই কিউ টেস্টের সফল প্রতিযোগীদের এপ্রিল '87 মাসে অনুষ্ঠিতব্য বিজ্ঞান সমাবেশে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট অর্পণ করা হবে। —সম্পাদক

## প্রতিযোগিতার কুপন

সিনিয়র/জুনিয়র/জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট, আই কিউ টেস্ট, এবং ফোটো ক্যুইজ-এর উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি........................................................................

ঠিকানা........................................................................

বয়স....................................শ্রেণী ....................

বিদ্যালয়ের নাম..............................................................

আই কিউ টেস্ট / সিনিয়র / জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট ফোটো ক্যুইজ-এর উত্তর পাঠালাম।

নিজে নিজে কর

# ইলেকট্রনিক মোটর সাইকেল হর্ন

তাপসকুমার দাস

আজ তোমাদের ইলেকট্রনিক মোটর সাইকেল হর্ন তৈয়ারি করার পদ্ধতি শেখাবো। এটা তৈরি করা খুবই সহজ।

এটা তৈরি করতে যে জিনিসগুলি লাগবে তার নাম :—

১। ট্রানস্ফরমার—6V output একটা
২। লাউড স্পিকার—একটা
৩। ট্রানজিস্টার—AC 128 একটা
৪। কনডেনসার—1000 mfd 16V একটা

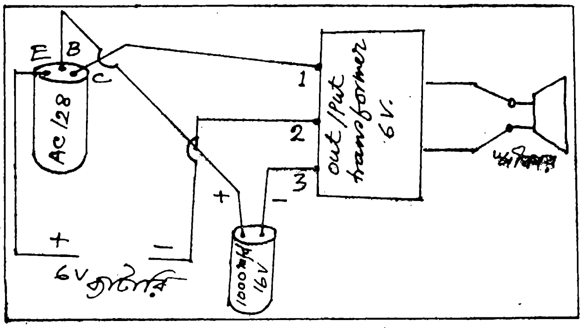


CIRCUIT DIAGRAM

পদ্ধতি :—ট্রানস্ফরমারের যে দিকে দুটি পয়েন্ট তার সাথে স্পীকারের দুটি প্রান্ত যোগ করো। তারপর ট্রানস্ফরমারের 1 নং পয়েন্টে ট্রানজিস্টারের কানেকটার যোগ কর, তারপর ট্রানজিস্টরের এমিটর ব্যাটারির পজেটিভ প্রান্তে যোগ হবে। আর বেসটি কণ্ডেন্সারের পজেটিভ প্রান্তে যোগ হবে। তারপর ট্রান্সফরমারের 2 নং পয়েন্টে ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্ত যোগ করতে হবে। সবশেষে 3 নং পয়েন্ট কণ্ডেন্সারের নেগেটিভ প্রান্ত যোগ করলেই কাজ শেষ।

বিঃ দ্রঃ—ট্রান্সফরমারের বেস-এর প্রান্তে নানা রকমের condencer-এর পর পর যোগ করে transformer-এর 3 নং পয়েন্টে যোগ করলে নানারকম সুর বের হবে।

প্রযত্নে—রাজলক্ষ্মী সিনেমা হল, জেলা—24 পরগনা, গ্রাঃ + পোঃ—কাকদ্বীপ, থানা—কাকদ্বীপ

# শব্দকূট

শ্রীদাম সরকার

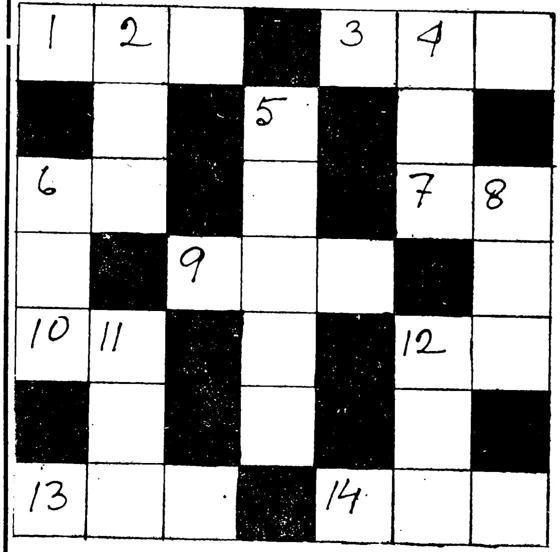


**পাশাপাশি ঃ**

1. সূর্যালোকের একটি তেজস্ক্রিয় কণা।
3. কাঁচা চামড়া পরিষ্কারের পদ্ধতি।
6. বসন্তের দূত যার বাসায় ডিম পাড়ে।
7. অ্যাসিডের সংস্পর্শে যে লিটমাস লাল হয়।
10. নুতন-এর সমার্থক শব্দ।
12. বাংলার অপর নাম।
13 হজরত মহম্মদের সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থান।
14. যে জাতি পৃথিবীতে সবচেয়ে উন্নত।
9. হিমবাহ মাটি তৈরি হয় হিমবাহের '—' সঞ্চিত হয়ে।

**উপর নিচ ঃ**

2. দুর্বল শরীরে প্রয়োজনীয়।
4. চাষীদের একটি সরল যন্ত্র।
5. বর্জনীয় পদার্থ দেহ থেকে না বেরিয়ে রক্তে জমতে থাকলে যে রোগ হয়।
6. কাঁচের চুড়িকে বলা হয়'——'।
8. একটি মসলা ফসল।
11. শরৎচন্দ্রের একটি উপন্যাস।
12. লাউ, কুমড়া প্রভৃতি গাছের আকর্ষে যে চলন হয়।

c/o বৈকুণ্ঠ সরকার গ্রাঃ—মিলন নগর পোঃ— বগুলা, জেলা —নদীয়া পিঃ—744502

# প্রশ্নোত্তর

প্ল্যানচেট সম্বন্ধে জানতে চেয়েছো রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষামন্দিরের নবম শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ ; উড়োজাহাজের ছায়া মাটিতে পড়ে না কেন জানতে চেয়েছো শুভময় ঘোষ, বালা-মেদিনীপুর থেকে ; মানাক্ষিরা-২৪ পরগনা থেকে বিপ্লব বিশ্বাস, অর্ঘ্য ও প্রতিম জানতে চেয়েছো দুগ্ধ বৃক্ষের কথা। মাত্র কিছু দিনের ব্যবধানেই এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। পরে সুযোগ পেলে পুনরায় উত্তর দেওয়া হবে।

প্রঃ—সি. ভি. রমন কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন। মারকিউরাস নাইট্রেটের আবিষ্কর্তা কে ?

**মহাদেব পাল**, বালা—মেদিনীপুর।

উঃ—সি. ভি. রমন 1888 খ্রীস্টাব্দের 7ই নভেম্বর মাদ্রাজের ( বর্তমান তামিলনাড়ুর ) ত্রিচিনাপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। মারকিউরাস নাইট্রেটের আবিষ্কর্তা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

প্রঃ—ফ্রনহোপার রেখা কাকে বলে ?

**সনৎ ঝা**, আড়াইডাঙ্গা, মালদহ।

উঃ—বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য রশ্মিকে বিশ্লেষণ করলে যে সাত রঙের আলোর পটি পাওয়া যায়, সেই পটিগুলির মাঝে মাঝে অসংখ্য কালো কালো রেখা লক্ষ্য করা যায়। উক্ত রেখাগুলি প্রথমে বিজ্ঞানী ফ্রনহোপার সনাক্ত করেছিলেন, তাই আবিষ্কর্তার নামানুসারে অনুরূপ নামকরণ।

সূর্যরশ্মি সূর্যপৃষ্ঠের বিশোষণ মণ্ডল নামক গ্যাসস্তরটিকে ভেদ করে আসে এবং বিশোষণ মণ্ডলে অবস্থিত নানাপ্রকার গ্যাস স্বজাতীয় বর্ণকে শোষণ করে নেয়। তাই উজ্জ্বল আলোকের পটিগুলির মাঝে মাঝে উৎপন্ন হয় কালো কালো রেখা। ঐ রেখাগুলিকে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা সূর্যদেহের উপাদানগুলির অস্তিত্ব নির্ণয় করেছেন।

প্রঃ—মঙ্গলগ্রহকে লাল দেখায় কেন ?

**বিপ্লব পুরকায়স্থ**, সোনারপুর, ২৪ পরগনা।

উঃ—বিজ্ঞানীদের মতে এককালে মঙ্গলের আবহমণ্ডলে যথেষ্ট অক্সিজেন ছিল। কালক্রমে সেই অক্সিজেন মঙ্গল পৃষ্ঠে লোহার সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে লাল লাল লোহার অক্সাইডে পরিণত হয়েছে। তাই লাল দেখায় মঙ্গলকে।

প্রঃ—জায়মান হাইড্রোজেন ও পারমাণবিক হাইড্রোজেনের মধ্যে পার্থক্য কি ?

**সৌমিত্র পাল**, গোপালপুর, বর্ধমান।

উঃ—তাপ বা তড়িতের সাহায্যে হাইড্রোজেন অণু বিভাজিত হলে যে সদ্যোজাত হাইড্রোজেন পরমাণু উৎপন্ন হয় তাকে বলা হয় পারমাণবিক বা সক্রিয় হাইড্রোজেন। আর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোন পদার্থ থেকে [ যেমন ছিবড়ে দস্তা ও সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় ] সদ্য সদ্য মুক্ত হয়ে এবং যতক্ষণ না অণুগঠন করছে ততক্ষণ যে অবস্থায় থাকে তাকে বলে সদ্যোজাত বা জায়মান অবস্থা। এগুলি ক্ষণস্থায়ী অবস্থা। তবে দুই অবস্থার মধ্যে পারমাণবিক অবস্থাতে হাইড্রোজেন অধিক সক্রিয়। পারমাণবিক অবস্থায় স্বাভাবিক তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন বহু ধাতু ও অধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটায় এবং হাইড্রাইড গঠন করে, কার্বন মনক্সাইডকে বিজারিত করে এবং ফরমালডিহাইড উৎপন্ন করে, ইত্যাদি ; কিন্তু জায়মান অবস্থায় হাইড্রোজেন তা পারে না। অপর দিকে অক্সিজেনের সঙ্গে পারমাণবিক হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন পার অক্সাইড গঠন করে কিন্তু জায়মান হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে জল।

প্রঃ—তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ কী ?

**মোজাম্মেল হক**, সাদিখাঁর দেয়াড় বিদ্যানিকেতন, মুর্শিদাবাদ।

উঃ—নক্ষত্র পৃষ্ঠ থেকে পারমাণবিক বিক্রিয়ায় ও অন্যান্য কারণে কতকগুলি রশ্মি উৎপন্ন হয় এবং এগুলি তরঙ্গের আকারে মহাবিশ্বের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেগুলো যথাক্রমে (1) এক মিলি. মি থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বেতার রশ্মি, (2) $10^{-1}$ সেমি থেকে $8\times10^{-5}$ সেমি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অবলোহিত রশ্মি, (3) $8\times10^{-5}$ সেমি থেকে $4\times10^{-5}$ সেমি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোক রশ্মি, (4) $4\times10^{-5}$ সেমি থেকে $10^{-6}$ সেমি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের অতি বেগুণী রশ্মি, (5) $10^{-6}$ সেমি থেকে $10^{-9}$ সেমি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রঞ্জন রশ্মি এবং (6) $^{-9}$ সেমি অপেক্ষা কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের গামা রশ্মি।

প্রঃ—কোয়াসার ও পালসার সম্বন্ধে জানতে চাই।

**সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ**, ২৪ পরগনা।

উঃ কোয়াসারের কথা মাত্র কিছুদিন আগে আলোচনা করা হয়েছে। আর পালসারের পুরো নাম Pulsatig Radio Sources। এরাও কোয়াসারের মত অতি অদ্ভুত ধরনের জ্যোতিষ্ক। 1968 সালে কেমব্রিজের মূলার্ড মানমন্দির থেকে অ্যান্টনী হিউইকা এবং তার সহকর্মীরা আবিষ্কার করেন। তবে আসল জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে খুব বেশি তথ্য এখনও লাভ করা সম্ভব হয়নি। জানা গেছে, এদের পৃষ্ঠদেশ থেকে ভেসে আসা বেতার তরঙ্গ বড় অদ্ভুত ধরনের। এক সেকেণ্ডেরও কম সময়ের ভেতরে ঝলকে ঝলকে বেতার তরঙ্গ ছুটে আসে তারপর কিছুক্ষণের জন্য একেবারে বিরতি। বিরতির সময়টাও কম—মাত্র এক সেকেণ্ডের মত।

আজ পর্যন্ত মাত্র গুটি দশেক পালসার আবিষ্কৃত

হয়েছে। ওদের ব্যাস পাঁচ হাজার কিলোমিটারের মত এবং 50 কোটি থেকে 200 কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থান করছে। অনেকের মতে ওরা স্পন্দনশীল শ্বেত বামন [ নক্ষত্রের শেষ পরিণতি ] বা কোন নিউট্রন নক্ষত্র।

**প্রঃ** চাল থেকে মুড়ি কী ধরনের পরিবর্তন ?

**মমতাজ খাতুন**, পলতা, বর্ধমান।

উঃ—আসলে এটিকে ভৌত পরিবর্তন বলেই ধরা হয়। তবে চালকে ভেজে মুড়িতে পরিবর্তন করালে চালের স্টার্চের কিছু কিছু রাসায়নিক পরিবর্তনও হয়ে থাকে। তা না হলে মুড়িকে ভিজিয়ে পুনরায় শুকিয়ে নিলে পূর্বের চালকেই ফেরৎ পাওয়া যেত।

**প্রঃ**—ব্লিচিং পাউডারের ফরমূলা কী ?

**গঙ্গাধর ঘোষ**, মাসিদপুর, বিরুহা, বর্ধমান।

উঃ—Ca (Ocl) Cl ( ক্যালসিয়াম ক্লোরো হাইপোক্লোরাইড )।

**প্রঃ**—চাপ ও তাপ বদলালে গ্যাসের আয়তন বদলায়। অণুর সংখ্যাও কী বদলে যায় ?

**মৌসুমী মাইতি**, 30/বি/2 রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কলি-54।

উঃ—অণুর সংখ্যা বদলায় না।

**প্রঃ**—থার্মোমিটারে পারদ ব্যবহারের সুবিধাগুলি কি কি ? গ্রীষ্মকালে সাদা পোষাক ও শীতকালে কালো পোষাক ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয় কেন ?

**সৌগত দত্ত**, বুড়া শিবতলা, চুঁচুড়া, হুগলী।

উঃ— তাপমাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পারদের আয়তন পরিবর্তন বেশ নিয়মানুগ হয়। অন্যান্য অনেক তরল অপেক্ষা তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে পারদের আয়তন অতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধিও পেয়ে থাকে। তাছাড়া পারদ বেশ চকচকে হওয়ায় দেখার সুবিধা, বস্তু থেকে অল্প তাপ শোষণ করে এবং কাছের দেওয়ালও ভেজায় না। যেহেতু ওর হিমাঙ্ক—39° সেলসিয়াস এবং স্ফুটনাঙ্ক 350° সেলসিয়াস, তাই এই বিরাট ব্যবধানের তাপমাত্রা মাপাও সম্ভব হয়ে থাকে।

কালো পোষাক বিকীর্ণ তাপকে শোষণ করতে পারে বলে দেহকে গরম রাখে এবং সাদা পোষাক বিকীর্ণ তাপকে প্রতিফলিত করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে বলে গরমে শরীর তত গরম অনুভব করে না।

**প্রঃ** জল 100°তে ফুটে বাষ্পে পরিণত হয়। জ্বরের সময় গায়ের তাপ 100°র যখন বেশি হয় তখন গায়ে জল পড়লে বাষ্পীভূত হয় না কেন ?

**সত্যজিৎ মাইতি** শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন হাইস্কুল।

উঃ জলের স্ফুটনাঙ্ক 100° সেলসিয়াস। গায়ের তাপমাত্রা মাপার জন্য যে সব থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয় তাদের দাগ কাটা হয় ফারেনহাইট স্কেল অনুযায়ী। এক ডিগ্রী ফারেনহাইট = $\frac{5}{9}$ ডিগ্রী সেলসিয়াস। গায়ের তাপমাত্রা 100° ফারেনহাইট হলে সেলসিয়াস স্কেলে হবে ( $100 \times \frac{5}{9}$ ) 55 5 ডিগ্রীর মত। গায়ের তাপমাত্রা 58° সেলসিয়াস উঠলেই মানুষ মারা যাবে।

**প্রঃ**—পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস কেমন ?

**রাজা সেনগুপ্ত**, 26/সি. পঞ্চানন মিত্র লেন, কলিকাতা-85।

উঃ ব্যাপারটা বেশ জটিল। প্রশ্নোত্তরের সীমিত অংশের মধ্যে আলোচনা করা খুবই কষ্টসাধ্য। তবু সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

ইলেকট্রনরা পরমাণু কেন্দ্রে অবস্থিত নিউক্লিয়াসের চারদিকে মোটামুটি বৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে। নিউক্লিয়াসে পজিটিভ চার্জবাহী যে কয়েকটি প্রোটন থাকে ঠিক সেই সংখ্যক নেগেটিভ চার্জবাহী ইলেকট্রনগুলি বাইরের কক্ষগুলিতে নির্দিষ্ট পথে এবং নির্দিষ্ট গতিতে নিউক্লিয়াসের চারদিকে আবর্তিত হয়। আবর্তনের গতি সেকেণ্ডে কোটি কোটি বার। সদা ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন মহলের ছবি প্রদত্ত ছবির মত হবে বলে অনেকের ধারণা।

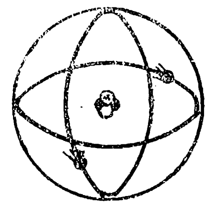

ইলেকট্রনদের পরিভ্রমণ পথ সবার এক নয়। কতকগুলি স্থায়ী ও নির্দিষ্ট চক্রাকার পথ বিদ্যমান। কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী শক্তি ক্রমান্বয়ে বিকীর্ণ হয় না—বিকীর্ণ হয় ঝাঁকে ঝাঁকে। প্রতিটি কক্ষপথের শক্তি ও এখানকার অবস্থানকারী ইলেকট্রনদের শক্তি অভিন্ন ও স্থির। তাই নির্দিষ্ট শক্তিসহ ইলেকট্রনরা নিউক্লিয়াসের চারদিকে একাধিক সুস্থিত স্তরে ঝাঁকে ঝাঁকে ঘুরে বেড়ায়। কোন কারণে ইলেকট্রনের শক্তি বৃদ্ধি পেলে উচ্চতর শক্তির সুস্থিত স্তরে বা কক্ষে গমন করে, অপরদিকে হ্রাস পেলে নিম্নতর শক্তিস্তরে নেমে আসে। শক্তিস্তরগুলি মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা n পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে তাদের দূরত্ব অনুযায়ী বৃদ্ধি পায়। নিউক্লিয়াসের নিকটতম সুস্থিত কক্ষটিতে n এর মান 1 এবং উক্ত কক্ষের শক্তির মানও সর্বনিম্ন। নিউক্লিয়াস থেকে দূরের দিকে কক্ষগুলিতে n-এর মান এক এক করে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কক্ষগুলির শক্তিও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

ইলেকট্রনরা যে কয়েকবার কক্ষপথে ঘোরাফেরা করে তাদের নাম যথাক্রমে K, L, M, N, O, P, Q। ধরা হয়েছে, ইলেকট্রন কক্ষের মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা n হলে এক একটি কক্ষের ইলেকট্রনের সংখ্যা হবে $2n^2$। তাই প্রথম K কক্ষে ইলেকট্রন সংখ্যা $2 \times (1)^2 = 2$, দ্বিতীয় L কক্ষে $2 \times (2)^2 = 8$, তৃতীয় M কক্ষে $2 \times (3)^2 = 18$, চতুর্থ N কক্ষে $2 \times (4)^2 = 32$। সবচেয়ে বাইরের কক্ষে ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ সংখ্যা হবে 8 এবং পূর্ববর্তী কক্ষে প্রথম ও দ্বিতীয় কক্ষ ব্যতীত ইলেকট্রনের সর্বোচ্চ সংখ্যা হবে 18।

ইলেকট্রনরা প্রথমে নিম্নতম শক্তি স্তরে প্রবেশ করে এবং সেই স্তর পূর্ণ হওয়ার পর উচ্চতর শক্তিস্তর অধিকার করতে থাকে। 2, 8, 18 32, 18, 8 ঠিক এইভাবে। যার যেমন পরমাণু ক্রমাঙ্ক তার তেমনই বিন্যাস হয়। উদাহরণস্বরূপ হিলিয়ামের 2, নিয়নের 2+8, আরগনের 2+8+8, ক্রিপটনের 2+8+18+8, জেননের 2+8+18+18+1, রেডনের 2+8+18+32+18+8। এরা সবাই নিষ্ক্রিয় মৌল তাই তাদের প্রত্যেকের বাইরের কক্ষ প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকে। অপরাপরদের ক্ষেত্রে অনুরূপ বিন্যাসরীতি হলেও বাইরের কক্ষ 8টি ইলেকট্রন সংখ্যা দ্বারা পূর্ণ থাকে না।

পরমাণুর বর্ণালী বিশ্লেষণ থেকে আরও জানা গেছে, এক একটি কক্ষে শক্তির একাধিক স্তরও আছে। এদের বলা হয় উপস্তর। উপস্তরগুলিকে চিহ্নিত করা হয় ইংরাজী বর্ণমালার ছোট হাতের অক্ষর s, p, d, f এর সাহায্যে। K শক্তি স্তরে উপস্তর একটি এবং সেটি s; L স্তরে দুটি s ও p; M স্তরে তিনটি s, p ও d; N স্তরে চারটি s, p, d, f। উপস্তরগুলিতে সর্বাধিক ইলেকট্রনের সংখ্যা যথাক্রমে 2, 6, 10 ও 14। অবশ্য প্রতিটি কক্ষের উপস্তরগুলি নির্ভর করে স্তরের মুখ্য কোয়াণ্টাম তথা ক্রমিক সংখ্যা n এর উপর।

উপস্তরগুলির আবার কক্ষ থাকে। একটি কক্ষতে 2টির বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে না। s উপস্তরে কক্ষের সংখ্যা 1, p উপস্তরে 3, d উপস্তরে 5, এবং f উপস্তরে কক্ষের সংখ্যা 7।

প্রঃ—(১) ডিম কি সম্পূর্ণ খাদ্য? প্রচুর ডিম খেলে কি স্বাস্থ্য ভাল থাকে? ডিমকে কাঁচা, সেদ্ধ অথবা ভাজা, কোন অবস্থায় গ্রহণ করা উচিত। হাঁস ডিম ও মুরগী ডিমের মধ্যে কোনটির খাদ্য মূল্য বেশি?

প্রশ্নগুলি পাঠিয়েছো (1) **সমীরণ মজুমদার**, নপাড়া কালীবাড়ী রোড-বারাসত;

(2) **ত্রিলোকেশ গোস্বামী**, দুর্গাপুর 5 এবং (3) **সঞ্জয় হালদার** বসিরহাট-24 পরগনা থেকে।

উঃ ডিম সম্পূর্ণ খাদ্য নয়। ডিমে প্রোটিনের পরিমাণ শতকরা 13.3 ভাগ, ভিটামিন সি একেবারে নেই এবং বি. শ্রেণীর ভিটামিন আছে নামে মাত্র।

কিছুকাল আগে পর্যন্ত বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল, ডিম আদর্শ খাদ্য। বর্তমানে ডিম খাওয়ার বিপক্ষেই অনেকে। এঁদের মতে, বেশি ডিম খেলে রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায়। যার জন্য লিভারের দোষ আসে এবং পরিণামে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। অতএব যাঁরা পুষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতিদিন ডিম খেয়ে থাকেন তাঁরা আপন অজ্ঞান্তে শরীরের প্রচণ্ড ক্ষতি করছেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আসবে কিডনী, হৃৎপিণ্ড ও লিভারের গোলমাল। ভাজা ডিম বিষবৎ। সেদ্ধ ডিমকে ভেজে খাওয়া এবং ওমলেট খাওয়া অতীব ক্ষতিকর। ডিমকে ভাজলে বিশেষ বিশেষ উপাদানগুলো এত কঠিন হয়ে ওঠে যে শরীর তাদের গ্রহণ করতে পারে না। অপরদিকে পাকস্থলীও বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে নিষ্কাশিত করতে অসমর্থ হয়। ফলে সেগুলি রক্তের সঙ্গে মিশে যায় এবং কোলেস্টেরলের পরিমাণকে বাড়িয়ে দেয়।

কাঁচা ডিম খাওয়া আদৌ উচিত নয়। ডিমের খোসার গায়ে অসংখ্য শ্বাসছিদ্র থাকে। বাইরের বহু জীবাণু উক্ত ছিদ্র পথে প্রবেশ করতে পারে এবং ভেতরে বাসাও বাঁধতে পারে। বর্তমানে যেভাবে পোলট্রি থেকে বাজারে ঝুড়ি ঝুড়ি ডিম যাচ্ছে এবং খোলা অবস্থায় বিক্রি হচ্ছে তাতে সেগুলির খাদ্যমূল্য অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়। বিশেষ করে রোদে ফেলে রেখে বিক্রি করার সময়। সূর্য কিরণই পুষ্টির মান কমায়। অপরদিকে হাজার হাজার মুরগীকে একত্রে প্রতিপালন করতে হয় বলে পোলট্রিকে জীবাণুমুক্ত করতে ডি. ডি. টি. গ্যামাক্সিন প্রভৃতিকে ছড়াতে হয়। এগুলির কিছু কিছু ডিমের ভেতরেও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকে।

পুষ্টি বিজ্ঞানীরা বলছেন, সপ্তাহে বড় জোর দুটি সেদ্ধ ডিম গ্রহণ করা যেতে পারে, তার বেশি কিছুতেই নয়। কেউ কেউ আরও বলছেন, Egg is actually injurious to health, chemical analysis has proved that the egg yolk contains excessive Cholesterol and waxy alcohol which deposits in the human liver and harden the blood vessels and arteries which invites coronary heart diseases.

হাঁস ডিম ও মুরগী ডিম দুটোর ভেতরে হাঁস ডিমে উপাদান অপেক্ষাকৃত বেশি। প্রতি 100 গ্রাম হাঁস ডিমে প্রোটিন থাকে 13·5 গ্রাম, ফ্যাট 13·7 গ্রাম, ক্যালসিয়াম 70 মিলিগ্রাম, লৌহ 3 মিলিগ্রাম, খাদ্য প্রাণ A 540 আই, ইউ, থিয়াসিন 0·12 মিলিগ্রাম, রাইবো ফ্লেভিন 0 26 মি.গ্রাম নিয়াসিন 0·2 ও ফসফরাস 260 মিগ্রা কিন্তু মুরগী ডিমে এ গুলো থাকে যথাক্রমে 1 ·3 গ্রাম, 13·3 গ্রাম, 6o মি. গ্রা, 2·1 মি. গ্রা, 60 আই, ইউ, 0 1 মি. গ্রা, 0·4 মিগ্রা, 0.1 মিগ্রা এবং 220 মি. গ্রা।

প্রঃ **খাদ্য হজম হওয়ার সহায়ক অংশগুলি কি কি?** বিধান রায়, লেজে-ডিব্রুগড়।

উঃ খাদ্য হজম হওয়ার প্রথম পর্যায় শুরু হয় মুখগহ্বরে। খাদ্যবস্তুকে মুখে পোরার সঙ্গে সঙ্গে একরকম স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চোয়ালদুটো ওঠানামা করে। তখন খাদ্যের বড় বড় টুকরা দাঁতের দ্বারা ছেদনে ও পেষণে ছোট ছোট অসংখ্য টুকরায় পরিণত হয় এবং মুখ গহ্বরের তিন জোড়া (এক জোড়া দুকানের দুদিকে প্যারোটিভ গ্রন্থি, দ্বিতীয় জোড়া জিভের তলায় অধঃ জিহ্বা গ্রন্থি এবং তৃতীয় জোড়া চোয়ালের

দু'দিকে অধঃচোয়াল গ্রন্থি ) গ্রন্থি থেকে নির্গত লালারস ( উপাদান 95·5%জল ; 3%কঠিন জৈব পদার্থ যথা অ্যাল-বুমিন, গ্লোবিউলিন ও মিউসিন নামের প্রোটিন ; টায়ালিন লাইপেজ, ফসফাটেজ, লাইসোজাইম প্রভৃতি এনজাইম, এবং ইউরিয়া, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যামিনো অ্যাসিড ইত্যাদি ; 2%অজৈব পদার্থ যথা সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম ফসফেট, পটাসিয়াম ক্লোরাইড, পটাসিয়াম থায়োসায়ানেট, ক্যালসিয়াম কারবোনেট, ক্যালসিয়াম ফসফেট প্রভৃতি। $O_2$, $N_2$, $Co_2$ প্রভৃতি সামান্য ) জারিত করে। আর তখনই আয়তনে কমে গিয়ে মণ্ডের মত হয় এবং গলাধঃকরণের উপযোগী হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে গলবিল, গ্রাসনালী হয়ে খাদ্যবস্তু পাকস্থলীতে প্রবেশ করলে তিন পর্যায়ে জারকরস নির্গত হয়। প্রথম স্নায়ুজ পর্যায়ে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, পেপসিন ও শ্লেষ্মা ; দ্বিতীয় পাকস্থলী পর্যায়ে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও গ্যাসট্রিন ; তৃতীয় আন্ত্রিক পর্যায়ে আন্ত্রিক গ্যাসট্রিন প্রভৃতি ক্ষরিত হয়। আন্ত্রিক পর্যায়ে পরিপাকের জন্য বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর খাদ্যের উপাদানগুলিই বিশেষ বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং রাসায়নিক পদার্থসমূহের ক্ষরণ ঘটায়। আন্ত্রিক গ্যাসট্রিন ছাড়া ডিওডিন্যালের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী থেকে নির্গত কয়েক প্রকারের হরমোনও অংশগ্রহণ করে।

এছাড়া অগ্ন্যাশয় থেকে ক্ষরিত অগ্ন্যাশয় রস এবং যকৃত থেকে ক্ষরিত পিত্তরসও পরিপাক ক্রিয়ায় সাহায্য করে। অগ্ন্যাশের রস ক্ষারীয় এবং এর উপাদান নানারকম এনজাইম। সাধারণত প্রোটিন, ফ্যাট ও কারবোহাইড্রেট জাতীয় খাদ্যকে পরিপাক করে এবং পাচক রসকে প্রশমিত করে। পিত্তরসও ক্ষারধর্মী।

পিত্তরস বিশেষ করে স্নেহদ্রব্যকে পরিপাক করে এবং লোহা, ক্যারোটিন বা খাদ্যপ্রাণ A কে বিশোষিত হতে সাহায্য করে।

---

**আগামী সংখ্যা থেকে 'প্রশ্নোত্তর' বিভাগের নাম বদলে হবে 'বলতে পারো কেন ?'**

---

**প্রঃ** গরু ও মহিষের দুধে কি কিছু পার্থক্য আছে ?
কৃষ্ণগোপাল ও পুতুল, চাঁদমারী, আসানসোল।

**উঃ** উভয় দুধের উপাদান একই। শুধু কম-বেশি এই মাত্র। প্রতি 100 গ্রাম গরুর দুধে থাকে প্রোটিন 3·2 গ্রাম ফ্যাট 4·1 গ্রাম, শর্করা 4·4 গ্রাম, ক্যালসিয়াম 120 মিলিগ্রাম, লৌহ ·2 মিলিগ্রাম, খাদ্যপ্রাণ A 174 আই, ইউ, খাদ্যপ্রাণ $B_1$ ·05 মিগ্রা, খাদ্যপ্রাণ $B_2$ ·1 মিগ্রা, নিয়াসিন ·1 মিগ্রা. খাদ্যপ্রাণ C 2 মিগ্রা। মহিষ দুধে প্রোটিন 4·3 গ্রাম, ফ্যাট 8·8 গ্রাম, শর্করা 5 গ্রাম, ক্যালসিয়াম 210 মি. গ্রা, লৌহ ·2 মিগ্রা, খাদ্যপ্রাণ 160 আই, ইউ, খাদ্যপ্রাণ $B_1$ ·04 মিগ্রা, খাদ্যপ্রাণ $B_2$ ·1 মিগ্রা, নিয়াসিন ·1 মিগ্রা এবং খাদ্যপ্রাণ C 1 মিগ্রা থাকে।

সুধাংশু পাত্র

# বাংলায় প্রকাশিত প্রথম কুইজ বুকস সিরিজ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত

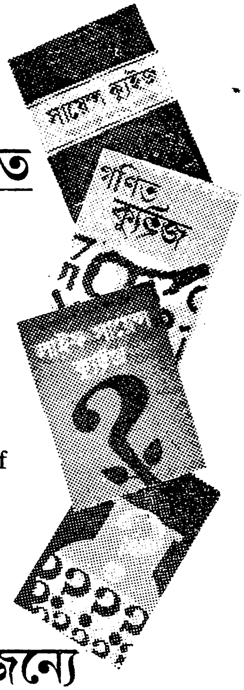

শুধু প্রশ্নোত্তরের আসরে যাবার সাহসই আসবে না সেই সঙ্গে স্কুলের অনেক objective পরীক্ষার উত্তর দিতেও সুবিধা হবে। —*যুগান্তর*

সময় কাটানো ছাড়া অনুশীলন ও বুদ্ধিচর্চার প্রয়োজনে বইগুলি খুবই কাজের। এছাড়া প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতেও সব ক'টি বই সাহায্য করবে। —*দেশ*

**Popularity of Quiz book to the belief that they groom students for Competitive Examinations**
—*The Statesman*

# আপনার ছেলেমেয়েদের বুদ্ধিদীপ্ত করে তোলার জন্যে এক্ষুণি এক সেট বই কিনে দিন

অমরনাথ রায় ॥ কেমিস্ট্রী কুইজ
অমরনাথ রায় ॥ নলেজ কুইজ
অলক চক্রবর্তী ॥ ফিজিক্স কুইজ
অমরনাথ রায় ॥ সায়েন্স কুইজ
অরূপরতন ভট্টাচার্য ॥ গণিত কুইজ
তারকমোহন দাস ও সীমা সেন ॥ লাইফ সায়েন্স কুইজ

*প্রতিটি বই ১০ টাকা। দুটি বই একত্রে নিলে ভি পি চার্জ লাগবে না।*

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৯

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 6 th Yr Vol –12· APRIL –1987/Regd.No.WBEC/255

# স্টুডেন্ট সায়েন্স এনসাইক্লোপিডিয়া

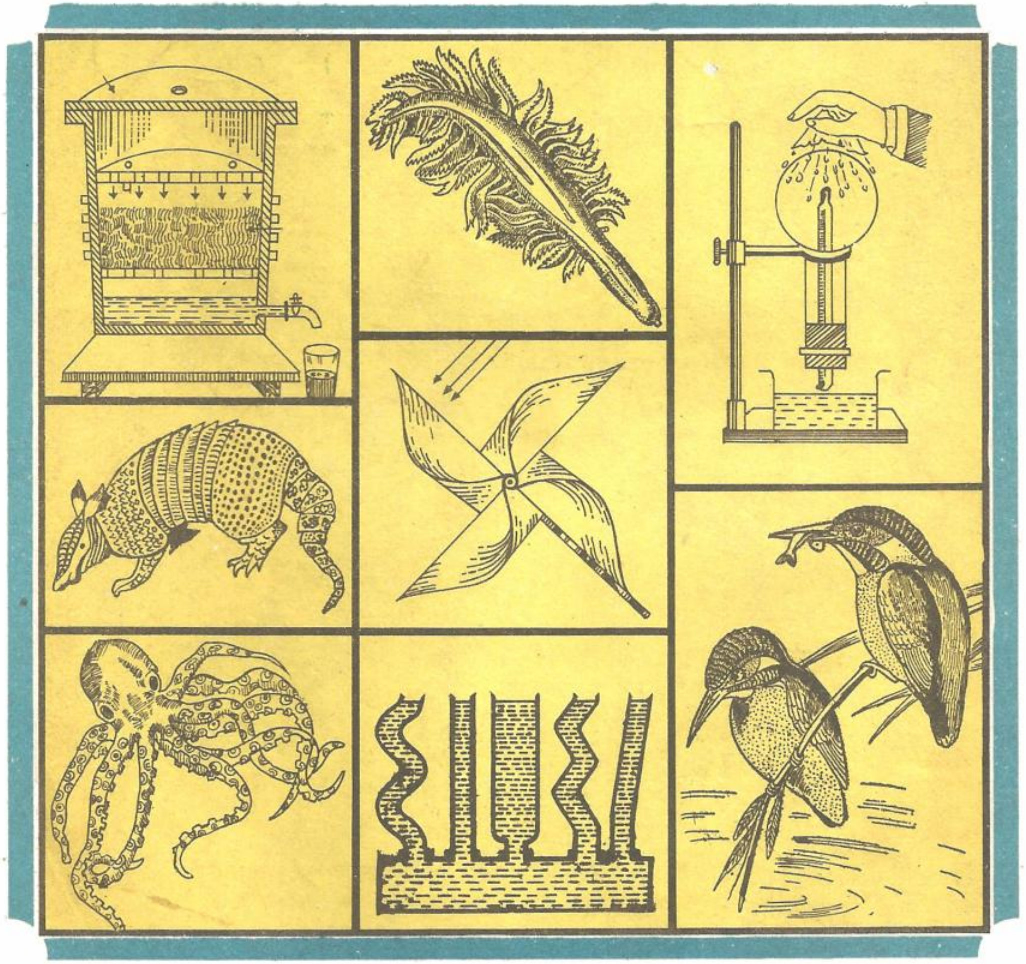

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ ● ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯।

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-9 থেকে প্রকাশিত এবং 8A, দীনবন্ধু লেন, কলকাতা-6, নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রিত। প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-12।

দাম ঃ 4·00 টাকা।